Vol. 8 | No. 2 | 1964

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ-জলিখা

Volume	8
Issue	2
Year	1964
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ এনামুল হক
Published online	December 16, 1964
DOI	10.62328/sp.v8i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v8i2.1
Pages	1-51
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ
শীত, ১৩৭১

Check for updates

শাহ মুহম্মদ সগীরের "ইউসুফ-জলিখা"

(রচনা কাল : ১৩৯৮—১৪১০ খ্রীঃ মধ্যে)

মুহম্মদ এনামুল হক

॥ ১ ॥

বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দান যে বর্তমান,—সে-সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। তবে, এ-কথা সচরাচর বলা হয় যে, বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানদের পরোক্ষ দান অনেক পূর্ববর্তী এবং প্রত্যক্ষ দান বহু পরবর্তী সপ্তদশ শতাব্দীর ঘটনা। মুসলমানেরা খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে যে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক ব্যাপার হইলেও, সপ্তদশ শতাব্দীর অন্ততঃ দুই শতাব্দী পূর্ব হইতে বাংলা-সাহিত্যে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দান যে বিদ্যমান ছিল, ইহাও বর্তমানে একটি ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হইয়াছে। শাহ মুহম্মদ সগীর নামক এক মুসলিম কবির "ইউসুফ-জলিখা" নামক একটি বাংলা কাব্যের আবিষ্কারেই এই ঐতিহাসিক সত্যটি প্রতিষ্ঠিত। এই কাব্যের রাজ-প্রশস্তি হইতে জানিতে পারা যায়, গৌড়ের সুলতান গিয়াসু-দ্-দীন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৯৭-১৪১০ খ্রীঃ) কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[১] সুতরাং, "ইউসুফ-জলিখা" খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কাব্য।

১ 'ইউসুফ-জলিখা' কাব্যের রাজ-বন্দনাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

তিরতিএ পরণাম করোঁ রাজ্যক ঈশ্বর।
বাঘে ছাঘে পানি খাএ নিভয় নিডর॥
রাজ রাজশ্বর মৈদ্ধে ধার্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নির্প জগত বিদিত॥
মনুস্বের মৈদ্ধে জেহ্ন ধর্ম অবতার।
মোহানরপতি গ্যেছ পিরথিম্বির সার॥
ঠাঁই ঠাঁই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজএ।
পুত্র সিস্ত হন্তে তিঁহ মাগে পরাজএ॥
মোহাজন বাক্য ইহ পুরণ করিআ।
লইলেন্ত রাজপাট বঙ্গাল গৌড়িআ॥
করুণা হীদএ রাজা পুণ্যবন্ত তর।
সবগুণে অসীম অতুল মনোহর॥
* * *
রমণী বল্লভ নির্প রসে অনুপমা।
কনে বা কহিতে পারে সে গুণ মহিমা॥
জিনিলা নির্পতি সব করিআ সমর।
জএবাদ্য দুন্দুমি বাহন্ত উঞ্চসর॥
* * *
জাবত জীবন মুঞি দেখিলুঁহি কাম।
তান ভক্তি বিনা ধিক নাহি আর ধাম॥
মোহাম্মদ ছগির তান আজ্ঞাক অধীন।
তাহান আছুক জস ভুবন এ তিন॥

বলাবাহুল্য, এখানে যে 'গ্যেছ' বা গিয়াসু-দ্-দীন রাজার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি যুদ্ধে পিতাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'বাংলা' ও 'গৌড়' রাজ্য দখল করেন। কবি 'গ্যেছ'-কে পিতৃহন্তা না বলিয়া, কৌশলে ব্যাজস্তুতিতে বলিয়াছেন,—ইনি সেই গিয়াস, যিনি সংস্কৃত মহাজন বাক্য "সর্বত্র বিজয়মিচ্ছেৎ, পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্" (অর্থাৎ মানুষ সর্বত্র নিজের বিজয় কামনা করে; কিন্তু পুত্র ও শিষ্যের কাছ হইতে পরাজয় চায়)—পূর্ণ করিয়া 'বঙ্গ' ও 'গৌড়' দেশ জয় করিয়াছেন। এই গিয়াস বাংলার ইতিহাসের গিয়াসু-দ্-দীন আজম শাহ ব্যতীত আর কেহ নহেন। তিনি ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

ইউসুফ-জলিখার প্রণয়-কাহিনী অতি প্রাচীন। বাইবেল ও কুর-আনে 'প্যারাবোল' বা নৈতিক-উপাখ্যান হিসাবে এই কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত মুল-কাহিনীকে পল্লবিত করিয়া ইরানের মহাকবি ফিরদৌসী (মৃত ১০২৫ খ্রীঃ) ও সুফী কবি জামী (মৃত ১৪৯২ খ্রীঃ) তাঁহাদের "ইউসুফ-জলিখা" নামক কাব্য দুইখানি রচনা করিয়া-ছিলেন। ফিরদৌসীর "ইউসুফ-জলিখা" একটি রমণ্যাস বা রোমাঞ্চ এবং জামীর "ইউসুফ জলিখা" একটি 'এলিগরিক্যাল এপিক' বা রূপক-কাব্য। বিষয়-বস্তু বা অনুবাদগত দিক হইতে সগীরের কাব্যের সহিত উক্ত কাব্যদ্বয়ের কোনটিরই হুবহু মিল নাই। তবে, সগীরের কাব্য ফিরদৌসীর কাব্যের ন্যায় রমণ্যাস বটে। জামী তাঁহার পরবর্তী কবি; সুতরাং, তাঁহার কথা উঠেই না। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, কুরআন ও ফিরদৌসীর কাব্য ব্যতীত মুসলিম-কিংবদন্তীতে ও স্বীয় সৃজনী-প্রতিভায় নির্ভর করিয়াই শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁহার "ইউসুফ জলিখা" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের জীবন-কথা জানা যায় না। কেননা, তাঁহার কাব্যে আত্মবিবরণী বলিতে সচরাচর যাহা বুঝাইয়া থাকে, তাহা তিনি লেখেন নাই। তবে, তাঁহার উপাধি দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি 'দরবেশ' -বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রামে ও একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি ত্রিপুরায় আবিষ্কৃত হওয়ায়, বিশেষতঃ তাঁহার কাব্যে ব্যবহৃত কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দ আজও চট্টগ্রামী বাংলা উপভাষায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া, অন্য প্রমাণের অভাবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, তিনি চট্টগ্রাম জিলার অধিবাসী ছিলেন।

একমাত্র "ইউসুফ-জলিখা" ব্যতীত কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের অন্য কোন কাব্য বা কবিতা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাতে তিনি অন্য কোন কাব্য রচনা করেন নাই,— এমন মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। আলোচ্য কাব্যখানি পাঠ করিলে দেখা যায়, ইহা বেশ পরিণত রচনা। তাঁহার ভাষা প্রাচীন বটে, তবে কাঁচা হাতের লেখা নহে। ইহা রচনার পূর্বে তিনি অন্য লেখায় হাত পাকাইয়া থাকিবেন।

কাব্যটিতে কোন বিদেশী আবহ নাই বলিলেও চলে। বাংলার পরিবেশ এই কাব্যের রক্তমাংস ও বাংলার আবহ ইহার প্রাণ বলিয়া কাব্যখানি পাঠ করিতে করিতে মনেই হয় না যে, ইহা কোন বিদেশীয় পুস্তকের অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদ। তবে, তিনি কিতাব-কোরান দেখিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করিতেও কসুর করেন নাই। ইউসুফের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বনী আমীনের সহিত মধুপুরীর (ভাওয়ালের অন্তর্গত 'মধুপুর' কি ?) গন্ধর্বরাজ কন্যা বিধুপ্রভার বিবাহ-কাহিনী কোন্ কিতাব-কোরানে পাওয়া গিয়াছিল, বলিতে পারি না। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, কাব্যখানি মুসলিম কিংবদন্তী-নির্ভর রচনা।

॥ ২ ॥

আল্লাহ ও রসুল, মাতাপিতা ও গুরুজন এবং রাজবন্দনান্তে "ইউসুফ -জলিখা" কাব্য আরম্ভ হইয়াছে। কাব্যবর্ণিত কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ :—

পশ্চিম দেশে তৈমুস নামে এক প্রবল-প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি বহুদিন নিঃসন্তান থাকিয়া অনেক দান ধর্ম করার পর এক কন্যা রত্ন লাভ করেন। অতি আনন্দে ও যত্নে কন্যার নাম রাখা হয় "জলিখা"। যথাকালে জলিখা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে যৌবনশ্রী ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল। যে তাঁহাকে দেখিল, সে-ই ভাবিতে লাগিল—

কেশ বেশ সুভেস অলক বঙ্ক ফন্দি।
সুরপুরী হুরী কিবা হেরি কাম বন্দী॥
* * *
নহলী যৌবনী কন্যা সর্ব কলাজিত।
শরৎ চন্দ্রিমা জেহ্ন নক্ষত্র বেষ্টিত॥

এই সময়ে জলিখা একে একে তিন বৎসরে তিনবার স্বপ্নে এক সুপুরুষকে দেখিয়া তৎপ্রতি প্রেমাসক্তা হইলেন। তিনি আর কেহ নহেন,— মিসরাধিপতি আজিজ-মিসর। তৈমুস-রাজ তাঁহার কন্যা জোলেখাকে আজিজ-মিসরের সহিত বিবাহ দিবার জন্য মিসরে দূত প্রেরণ করিলেন। দৌত্য সফল হইল; আজিজ-মিসর তৈমুস রাজ-কন্যা জলিখাকে বিবাহ করিতে রাজী হইলেন। জলিখা যথাসময়ে মিসরে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার সহিত

আজিজ মিসরের দেখা হইল। হায়! জলিখা দেখিলেন যে, এই আজিজ সেই 'আজিজ' নহে। অথচ ইহাকেই বিবাহ করিতে হইবে, এই কথা ভাবিয়া, জলিখার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি সখীগণকে ডাকিয়া গদগদ কণ্ঠে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন :—

লাগ্নিকা ছন্দ-লাচারী-রাগ কোরা

শুন শুন সখি
জার তরে হৈলুঁ দুখী,—
প্রাণের সখি ল!
প্রথম স্বপ্নেত দেখি
হৃদয় অন্তরে কামহতা॥
এ তিন বরিখ ধরি,
রজনী বসিআ ঝুরি,—
প্রাণের সখি ল!
বিরহ আনলে পুড়ি
কাহাত কহিমু এহি কথা॥
মোর হেন বিপরীত কাজ
কলঙ্কিনী ভুবন সমাজ॥
সে জন ন হএ এহি,
স্বপ্নেত দেখিলুঁ জেহি,—
প্রাণের সখি ল!
মোর তরে গেল কহি,
সেহি মোর পরমার্থ বাণী॥
দোসর স্বপ্নের কথা,
কহিতে মরম ব্যথা,
প্রাণের সখি ল!
কহিল সে মোক কথা,
আকুল হইলুঁ তথা,
শূনিতে হইলুঁ বুদ্ধি হানি॥

চঞ্চল হইল মতি,
চপল হৃদয় গতি,
প্রাণের সখি ল !
প্রমাদ হইল অতি
কথা পাইমু তাহান উদ্দেশ ॥
তিঅজ স্বপ্নেত দেখি,
আঞ্চলে ধরিলুঁ পেখি,
প্রাণের সখি ল !
প্রত্যক্ষ দেখিলুঁ আঁখি
চিন্তিত হইল তনু শেষ ॥
মুঞি নারী কামরতা,
বিহি মোরে বিড়ম্বিতা,
প্রাণের সখি ল !
আপনা রাখিমু কথা
পাষাণে চাপিল কর মোর ॥
বিষণ্ণ হইল কাজ
জাইমু কমন রাজ
প্রাণের সখি ল !
কহিতে আপনা কাজ,
ভাবিতে হইল মন ভোর ॥

এইরূপ আক্ষেপান্তে জলিখা তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার জন্য ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ইহাতেও তাঁহার মানসিক যন্ত্রণার অবসান হইল না। একাকী মনোদুঃখে বিলাপ করিতে করিতে তিনি মুর্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মুর্ছিত অবস্থায় আকাশ বাণী হইল :—

উঠ উঠ আয় কন্যা তাপিত হৃদয়।
তোহ্মার মনের বাঞ্ছা পুরিব নিশ্চয় ॥
আজিজ মিছির তোর নহে মনস্কাম।
সুখ ভোগ তার সঙ্গে হইবেক বাম ॥

আজিজ মিছির তোর পতিমাত্র লেখা।
তার যোগে হৈব তোর প্রভুসনে দেখা ॥

দৈববাণী শুনিয়া জলিখা চৈতন্য লাভ করিলেন ও আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার শান্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আজিজ মিসর জলিখার সহিত বিবাহের আয়োজন করিলেন। যথা সময়ে শুভ-বিবাহ সমাধা হৈল বটে, কিন্তু জলিখার সহিত আজিজ মিসর দাম্পত্য জীবন যাপনে অসমর্থ হইলেন। অথচ, অন্তঃপুরচারিণী অন্য নারীর সহিত আনন্দে বাস করিতে আজিজের কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইল না। ফলে, অন্তঃপুরে জলিখা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কিছুতেই তাঁহার সময় কাটিতে চাহে না। কাজে কাজেই—

খেনে হেথা খেনে হোথা ভ্রমে চারি দিশ।
উঠি বসি গোঞাএ দিবস অহর্নিশ ॥

গগন তারক দেখি চাহে এক মন।
তার সঙ্গে কাহিনী কহএ সর্বক্ষণ ॥

* * *

দুক্ষের কাহিনী কহি গোঞাএ রজনী।
বিশেষ তাপিত মন বিরহ আগুনি ॥

চান্দ ভেল মলিন বিরল তারাগণ।
অরুণ উদয় হৈলে হএ আনমন ॥

প্রভাতে পাখালে মুখ নয়ানের জলে।
রুদিত বদন তান প্রতি ঊষাকালে ॥

এইরূপে এক এক দিন করিয়া ভবিষ্যতের আশায় ভাঙ্গা বুকে জলিখা তাঁহার বিরহবিধুর দিনগুলি কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। আজিজ-মিসরের অন্তঃপুরে মনোবাঞ্ছিত জনের জন্য মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল, আর " বারমাসীতে " জলিখা তাঁহার মনোবেদনা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন ঃ—

দীর্ঘ ছন্দ—ধানশ্রী রাগ

ইতি দোয়াদশ মাস

মাঘ হৈল পরকাশ কানন কুসুম হাস
শুভ ছিরী পঞ্চমী প্রকাশ ।
মউলিত পুষ্পবন মদন মোহন ঘন
তা দেখিআ মোর মনুদাস ॥
বিকলিত আম জাম ভ্রমর ভ্রমএ কাম
সৌরভ ধাবন্তি চতুর্দিশ ।
মলয়া সমীর ধীর হৃদয় অন্তরে নীর
বিরহিণী জন অহর্নিশ ॥
ফাগুনে চৌগুণ রিত নানা পুষ্প বিকসিত
যুবজন কান্ত বিভূষিত।
পূরিত সকল অঙ্গ আগর চন্নন রঙ্গ
খেলএ আনন্দ হই চিত ॥
নবীন পরব বেশ সুরঙ্গ সুন্দর দেশ
তরু লতা নব রঙ্গ হাস ।
জুবক জুবতীগণ নানা বস্ত্র বিভূষণ
আভরণ বিচিত্র বিলাস ॥

* * *

* * *

আইল **কার্তিক** মাস চতুর্দিক পরকাশ
মন্দ মন্দ দেহ প্রতুসাএ।
তা হেরি উদাস পিয়া বিরহে বিদরে হিয়া
মন পক্ষী উড়িতে উশ্চাএ ॥
নিশি দিশি উঝলিত তারাগণ বিস্তারিত
বহএ সমীর ধীর ধীর।
ধবল কাচিয়া ফুল জেহেন পতাকা তুল
মদন চামর চমক্কার ॥

আঘ্রান আইল রিত নব শালী সমুদিত
সুগন্ধি সৌরভ জাএ দূর।
শারী শুক করে রোল নানা বন্ন ধান্যকুল
বিকসিত সব খিতিপুর॥
ঘরে ঘরে ধান্য রাশি নর পশুগণ হাসি
গগন রুচিত পরকাশ।
রাজা প্রজা উল্লসিত প্রবাস বঞ্চিত রিত
মোর পৈক্ষে জেহ্ন বনবাস॥
পৌষ আইল ওস রিত ভুবন পূরিত শীত
খোহামএ জেহ্ন বিষ্টিকার।
জুবক জুবতী মিলি কর্পূর তাম্বুল তুলি
বিলসিত নানা সুখসার॥
মুঞি বড় হতভাগী অহনিশি রহোঁ জাগি
প্রভু মোর নিদয়া হিদয়।
মোহাম্মদে কহে দুখী অবশ্য হইবা সুখী
নিশিশেষে রবির উদয়॥

॥ ৩ ॥

এই দিকে, কেনান দেশে এয়াকুব নামে এক নবী ছিলেন; তাঁহার দুই স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এয়াকুব নবীর দশ পুত্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে এক কন্যা ও দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। এই দুই পুত্রের মধ্যে এক জনের নাম 'ইউসুফ' এবং অপরটির নাম 'বনী আমীন' বা 'ইবনে আমীন' রাখা হয়। ইউসুফ এমন সুপুরুষ ছিলেন যে, তাঁহার ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং এয়াকুব নবীও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ফলে,—

এয়াকুব নবীর ইছুফ জেহ্ন আঙ্খি।
সর্বক্ষণ ইছুফ নয়ানে থাকে পেখি॥

এয়াকুব নবীর বাসভবনে একটি 'ধর্মতরু' ছিল। তাঁহার এক এক পুত্রের জন্মকালে এই বৃক্ষে একটি করিয়া শাখা অঙ্কুরিত হইত। সন্তান বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাখাটিও বড় হইত এবং এয়াকুব নবী তাহা কাটিয়া যষ্টি বানাইয়া পুত্রকে দান করিতেন। যখন ইউসুফ জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন এই বৃক্ষে আর ডাল নির্গত হইল না। ইহা লক্ষ্য করিয়া এয়াকুব নবী আল্লার কাছে ইউসুফের জন্য একটি যষ্টি ভিক্ষা করিলেন। ফলে, স্বর্গ হইতে এক 'আসা' বা যষ্টি নামিয়া আসিল। এয়াকুব নবী ইহা ইউসুফকে দান করিলেন; আর—

হেন 'আছা' দেখিআ ইছুফ করগত।
সর্বলোকে কহিলেন্ত আছার মহত্ত্ব॥

ইহাতে ইউসুফের ভ্রাতৃগণ দেখিল যে, তিনি শুধু পিতার স্নেহ অত্যধিক মাত্রায় লাভ করিতেছেন এমন নহে, বরং স্বর্গীয় 'আসা'-প্রাপ্তিতেও সৌভাগ্যবান। সুতরাং, তৎপ্রতি তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের ঈর্ষ্যা পোষণ করা একটি মামুলী ও স্বাভাবিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গেল। এমন সময় একদিন ইউসুফ স্বপ্নে দেখিলেন,—

একাদশ নক্ষত্র আওর রবিশশী।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভূমিতলে পশি॥

এই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা তিনি পিতাকে কহিলেন। পিতা এই স্বপ্ন কাহারও কাছে ব্যক্ত করিতে ইউসুফকে নিষেধ করিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ, ইহাতে কোন ফল হইল না। কারণ—

নিভৃতে ইছুফ তরে করিলা নিষেধ।
দৈববলে কেহ তাক করিলেক ভেদ॥
এহি কথা ভাই সবে সকল শুনিল।
বিধির নির্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারিল॥

অতঃপর ভ্রাতৃগণের মধ্যে ইউসুফকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলিল। ঠিক হইল যে, মৃগয়া করার ছলে ইউসুফকে বনে লইয়া গিয়া হত্যা করিতে হইবে। ইউসুফকে সঙ্গে লইয়া বনে মৃগয়া করিতে যাইবার প্রস্তাবটি যথাসময়ে

এয়াকুব নবীর নিকট পেশ করা হইল। নবী এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। তখন ভ্রাতৃগণ ইউসুফকে নানা কথা বলিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন এবং চেষ্টায় সফলকামও হইলেন। ইউসুফ পিতার নিকট বায়না ধরিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত মৃগয়া করিতে বনে গমন করিলেন। বনে পৌঁছিলে ষড়যন্ত্র অনুসারে ভ্রাতৃগণ ইউসুফের শরীর হইতে কাপড়-চোপড় খসাইয়া লইল, এবং অকস্মাৎ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ফলে, তাঁহাকে,—

কোহ্ন ভাই ক্রুদ্ধ হই মারে অনুরাগে।
আর ভাই নিকটে জায়ন্ত দয়াভাগে॥
সেহো ভাই ঠেলা দিআ ফেলে এক পাশ।
আর ভাই কাছে জাএ হইয়া হতাশ॥
সেহো ভাই নিদয়া হিঁদয় হৈআ মারে।
আর ভাই নিকটে জায়ন্ত বস্ত্র আড়ে॥
কোহ্ন ভাই মায়া নাহি সবে মারে বেড়ি।
কান্দিতে লাগিলা তবে বাপ অনুস্মরি॥

সকলে বলিতে লাগিলেন ইউসুফকে এই সুযোগে মারিয়া ফেল। কিন্তু, জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহাকে এইভাবে মারিতে দিলেন না। তাঁহার হস্তক্ষেপে ইউসুফকে বনমধ্যে এক কূপে নিক্ষেপ করা হইল। কূপে পড়িবার সময় ইউসুফকে ফিরিশতারা ধরিয়া ফেলিলেন এবং স্বর্গ হইতে একটি সুন্দর পাট আনিয়া তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি সেই স্বর্গীয় পাট ধরিয়া কূপের মধ্যে ভাসিতে লাগিলেন।

ইউসুফের বস্ত্র লইয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণ সানন্দে বাড়ি ফিরিতে ছিলেন; এমন সময় পিতার নিকট ইউসুফ-হত্যার কি কৈফিয়ৎ দিবে,— সে চিন্তা তাহাদের মনে দেখা দিল। পরামর্শের পর স্থির হইল যে, ইউসুফকে বনে বাঘে খাইয়াছে বলিয়া প্রচার করিতে হইবে এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ ইউসুফের কাপড় ছিঁড়িয়া, তাহাতে রক্ত মাখিয়া; পিতাকে ব্যাঘ্র কর্তৃক ইউসুফ হত্যার প্রমাণ দিতে হইবে। তাহাই করা হইল। এয়াকুব নবী কপট-কাহিনী বিশ্বাস না করিয়া, তাঁহার পুত্রগণকে ইউসুফহন্তা বাঘটি

ধরিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। পুত্রেরা বাধ্য হইয়া বন হইতে এক বাঘ ধরিয়া আনিল। কিন্তু, বনের পশু বলিল যে, নবী বা নবীবংশের কাহারও মাংস বাঘ খায় না। সেও ইউসুফকে হত্যা করে নাই। আসল ব্যাপারটি যে কি, তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়া, এয়াকুব নবী পুত্রশোকে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

॥ ৪ ॥

'মণিরু' নামে মিশরে এক মহাবণিক বাস করিতেন। তিনি এই সময়ে বহু বণিক ও লোকজন সঙ্গে লইয়া 'কেনান'-অভিমুখে বাণিজ্যের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য,—

এহি সাধু পূর্বকালে স্বপ্ন দেখিছিল।
পূর্ণিমার শশী তার ঘরেত পইসিল॥

বহুদিন এমন কোন সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। ফলতঃ, তিনি একরূপ স্বপ্নের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে বণিক-গোষ্ঠী যখন সীমান্তে অবস্থিত অরণ্যটি অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে পানীয় জলের অভাব দেখা দিল। তাঁহারা বাধ্য হইয়া এই অরণ্যে তাঁবু ফেলিয়া জলের সন্ধানে বাহির হইলেন। কিয়দ্দূরে এক জলপূর্ণ কূপের সন্ধান মিলিল। সুদীর্ঘ রসিতে কলসী (ঘড়া) বাঁধিয়া জল তুলিতে কূপ-মধ্যে ফেলা হইল। কি আশ্চর্য, কলসীতে বসিয়া জলের সহিত এক অনিন্দ্যসুন্দর যুবক উঠিয়া আসিল। তাঁহার রূপ দেখিয়া সকলে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে সাধুর নিকট লইয়া গেল। ইউসুফকে দেখিয়া সাধু মনে মনে ভাবিলেন, এতদিনে তাঁহার স্বপ্ন সফল হইয়াছে। এইবার তাঁহাকে বিনা বাণিজ্যে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ভাল করিয়া ইউসুফের মুখ ঢাকিয়া দিয়া 'মণিরু' তাঁহার দলীয় শ্রেষ্ঠিবর্গকে আহারান্তে দেশে ফিরিয়া যাওয়ার আদেশ দিলেন।

সকলেই আহারের অয়োজনে ব্যস্ত। এমন সময় এয়াকুব নবীর দশ পুত্র, তখনও ইউসুফ কূপমধ্যে বাঁচিয়া আছেন কিনা, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে আসিয়া, শূন্যকূপ দর্শনে ইউসুফের অনুসন্ধানে বাহির হইল এবং বণিকদের

মধ্যে ইউসুফকে আবিষ্কার করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল যে, তাহাদের এই 'দুরাচারী দাস' নিজের অসৎকর্মের জন্য কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ; তাহাকে তাঁহারা ঐ কূপ হইতে উঠাইয়া লইয়াছেন কেন ? দাসটিকে হয় যথোপযুক্ত অর্থ দিয়া কিনিয়া লইতে হইবে, না হয় তাহাদের কাছে ফিরাইয়া দিতে হইবে ; নতুবা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে লাভ করিতে হইবে। বণিকশ্রেষ্ঠ 'মণিরু' ভয় পাইয়া ইউসুফকে এই দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন ; তখন—

ইছুফে বোলন্ত আমি হই তান দাস।
আকাশের দিকে মুখ করিআ প্রকাশ॥

ইউসুফের এই উক্তিতে 'মণিরু'-সাধুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইউসুফকে ক্রয় করিয়া এই আকস্মিক বিপদের হাত হইতে মুক্তি লাভ করার কোন সহজ উপায় আছে কিনা,—সেই কথা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ—

সাধু বোলে মোর ঠাঁই ধন নাহি আর।
তামার ঢেপুয়া লহ এই মূল্য তার॥
ভাই সবে বোলে জেই দেহ ত সত্বর।
আহ্মা হোন্তে দূর হউ দিক দিগন্তর॥

এইভাবে 'মণিরু'-সাধু ইউসুফকে তাম্রমুদ্রায় (তামার ঢেপুয়ায়) ক্রয় করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার অন্য কোন সওদা হইল না। তজ্জন্য তিনি দুঃখিতও হইলেন না।

দেশে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই 'মণিরু'-সাধু দেখিতে পাইলেন দেশের সর্বত্র হট্টগোল শুরু হইয়া গিয়াছে। দূত-মুখে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে যে, 'মণিরু'-সাধু বিদেশ হইতে এক অপূর্ব দাস ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন ; এমন ক্রীতদাস জগতে দুর্লভ। আজিজ-মিসরও এই কথা জানিতে পারিলেন। ইউসুফকে তাঁহার দেখিবার ইচ্ছা হইল। এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, আজিজ-মিসর এক বিশিষ্ট দিনে সভা ডাকিয়া রাজ্যময় এক আদেশ জারী করিলেন যে,—

জথ রপবন্ত আছে নারী বা পুরুখ।
সুবেশ করিয়া আইস আহ্মার সমুখ॥

আদেশ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে 'সাজ-সাজ'-রব পড়িয়া গেল। মিসরে যত রূপবান নর ও রূপবতী নারী ছিল, রাজানুগ্রহ লাভের আশায়, তাহাদের সকলেই যথাকালে আজিজ-মিসরের দরবারে উপস্থিত হইতে চলিল। 'মণিরু'-সধুও ইউসুফকে সঙ্গে লইয়া মিসর-দরবারে যাত্রা করিলেন। চলিতে চলিতে—

নীল নামে গঙ্গা আছে মিছির ভূমিত।
তার তীরে মণিরু হৈলা উপস্থিত॥
ইছুফ সম্বোধি বলে সাধু গুণবান।
এহি নীল গঙ্গা নীরে করহ আসনান॥
সাধুর আদেশ পাইআ জলেতে নামিলা।
জল সুখমান ধর্ম যাপ্য আচরিলা॥
তান পদ পরশে নীলের পূণ্য নীর।
সুরেশ্বরী ধারা জেহ্ন সুধাবর্ণ খীর॥

নীল-নদের জলে স্নানান্তে পবিত্র ও সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত হইয়া ইউসুফ ও 'মণিরু'-সাধু রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন; ইউসুফকে বসিবার জন্য বহুমূল্য বিচিত্র আসন দেওয়া হইল। তাঁহাকে এই আসনে সমাসীন দেখিয়া সকলের মনে প্রতীয়মান হইতে লাগিল:—

সিদ্ধ বিদ্যাধর রূপ জিনি তান তনু।
মানব মূরতি ধরি মর্ত্যে আইল ভানু॥

এ আবার কেমন ক্রীতদাস? এমন ক্রীতদাস তো কখনও দেখি নাই! কে সে ভাগ্যবান, যে ইহাকে কিনিবে? ইহার মূল্যই বা কত হইবে? কি আশ্চর্য! এই ক্রীতদাস তো দাস নহে; বরং—

নাম দাস, ভুবনে ঈশ্বর হেন পেখি।
জগৎ ভরিল তান রূপ রেখ আঁখি॥

জলিখাও রাজ-অন্তঃপুর হইতে তাঁহার ধাত্রী ও সখীগণকে সঙ্গে লইয়া ক্রীতদাস ইউসুফকে দেখিবার জন্য উটের 'আম্বারীতে' আরোহণ করিয়া

দরবারে উপস্থিত হইলেন। ইউসুফকে দেখিয়া তিনি মূর্ছিতা হইলে, 'আম্বারী' রাজ-অন্তঃপুরে ফিরিয়া গেল। তথায় ধাত্রীর বিশেষ যত্নে তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। মূর্ছান্তে জলিখা ধাত্রীকে লাচারী ছন্দে গুর্জরী রাগে কহিলেন,—

শুন ধাঞি মোহোর বচন।
এহি মোর হরিল জীবন॥ ধ্রু
দেখাইল আপনক মুখ।
দিলেক বিরহ মনে দুঃখ॥
অন্তরিক্ষে দিল দরশন।
সে অবধি পোড়ে মোর মন॥

ধাত্রী জলিখাকে প্রবোধ দান করিল। ইহাতে তাঁহার হৃদয়-চাঞ্চল্য দূরীভূত হইলনা,—তাঁহার মনও কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। বাধ্য হইয়া জলিখা ইউসুফকে ক্রয় করিবার জন্য রাজ-দরবারে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—

ইছুফ কিনিতে আইল জথ বণিজার।
জার জেই মনে ভাএ মূল্য করিবার॥
এক বুঢ়ী কতখানি সুতা হাতে লৈআ।
ধাইতে ধাইতে জাএ আন উপেখিআ॥
লোকে পুছে কেনে ধাঅ কহ বৃদ্ধ নারী।
বুঢ়ী বলে মোর এহি পুঁজি ধন কড়ি॥
সাধুর মেলেত মোক গণিতে জুয়াএ।
মোর কর্ম ফলে তাক কিনিতে ন ভাএ॥
লোক সব হাসএ বুঢ়ীর বুঝি মতি।
ন পায় কিনিতে তাক লক্ষ কোটিপতি॥
ডাকোয়ালে ডাকি বলে শুন সাধুগণ।
ইছুফ কিনিতে আইস জার জথ ধন॥

অতঃপর, ইউসুফকে ক্রয় করিবার জন্য বহু বণিক আগাইয়া আসিয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা 'মণিরু'-সাধুকে দিতে চাহিল। 'মণিরু' বলিলেন, ইহা ইউসুফের

উপযুক্ত মূল্য নহে। তখন 'মণিরু'-সাধুর নিকট হইতে ক্রেতৃগণ ইউসুফের প্রকৃত মূল্য জানিতে চাহিলে, তাহাদিগকে জানানো হইল যে,—

তান যোগ্য মূল্য হয় কনক রতন।
মুকুতা প্রবাল হীরা চুনি মণি ধন॥
সব সমতুল্য করি জুখিবেক সার।
কিনিবারে আইস এহি মূল্য হৈল সার॥

এই ঘোষণার পর ক্রয়েচ্ছু সাধুগণ নিরাশ হইলেন। এমন কি, অধিক মূল্যে ইউসুফকে কিনিবেন কিনা, সে-সম্বন্ধে আজিজ-মিসরও বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। জলিখা আজিজ-মিসরের চিন্তার কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতৃদত্ত মণি-মাণিক্য দিয়া ওজন করিয়া ইউসুফকে কিনিবেন। তাঁহাকে যেন এই ক্রীতদাসটিকে কিনিবার অনুমতি দেওয়া হয়। আজিজের সম্মতিক্রমেই জলিখা—

এক এক মাণিক্য মিছির মূল্য জান।
সেহি রত্ন আনি দিলা সাধু বিদ্যমান॥
ইছুফ জলিখা সঙ্গে রত্ন মণি মূল্য।
তথাপিহ ইছুফক নহে সমতুল্য॥

এতৎসত্ত্বেও 'মণিরু'-সাধু ইউসুফকে আজিজের নিকট বিক্রয় করিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিলেন। কারণ—

লোকে বোলে মণিরু বড়হি ভাগ্যবন্ত।
ধনের ঈশ্বর হৈল সাধু গুণবন্ত॥

'মণিরু'-সাধু ইউসুফের পদধূলি লইয়া চলিয়া গেলেন। আজিজ 'পুত্রবাচ' দিয়া ইউসুফকে জলিখার হাতে সমর্পণ করিলেন। জলিখার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি ইউসুফকে নিজের অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। সেখানে জলিখার আদেশক্রমে ষোড়শোপাচারে ইউসুফের সেবা চলিল।

এই সময়ে একদা ইউসুফ অশ্বারোহণে নগর-ভ্রমণে বাহির হইলেন। মিসরে 'বারেহা' নামে এক বণিক ছিল। তাহার অপূর্বসুন্দরী যুবতী কন্যা ইউসুফকে দেখিবার জন্য পথে আসিয়া দাঁড়াইল। সে ইউসুফকে দেখিয়া অজ্ঞান হইল। সেবা-শুশ্রূষার পর সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলে, ইউসুফ তাহাকে প্রবোধ দিলেন ও তত্ত্বকথা শুনাইলেন। শ্রেষ্ঠী বারেহার কন্যার চিত্ত ইউসুফের তত্ত্বকথায় বিগলিত হইল। ফলে তাঁহার—

নীলগঙ্গা তীরেত গোফার মধ্যে বাস।
সর্বক্ষণ সমাধি করএ মনুদাস॥

॥ ৫ ॥

এইভাবে জলিখা ইউসুফের নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হইলেন। নানাবিধ ছলাকলায় ইউসুফকে ভুলাইবার প্রয়াস চলিল। কিন্তু, কিছুতেই ইউসুফের আত্মসংযম টুটিল না। জলিখা তাঁহার ধাত্রীকে অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে সকল কথা নিবেদন করিলেন ও তাহার নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। ধাত্রী জলিখাকে আশ্বস্ত করিলেন যে, ইউসুফের প্রতি তাঁহার আসক্তির কথা জানাইয়া, প্রণয়াস্পদের সহিত তাঁহার চির-বাঞ্ছিত মিলন ঘটাইয়া দিবে।

অতঃপর, ধাত্রী তাহার দৌত্য সমাধা করিলে, ইউসুফ উত্তর দিলেন, আজিজ-মিসর 'পুত্রবাচ' দিয়া তাঁহাকে জলিখার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং, তিনি জলিখার নিকট লৌকিক-সম্পর্কে পুত্র সমতুল্য। আপন গর্ভজাত সন্তান ও ধর্ম-পুত্রের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? অধিকন্তু,—

মহাদেবী যেন গুরু পত্নীর সমান।
রাজপত্নী মাতৃতুল্য মোর অনুমান॥
আজিজ বুলিল মোক তুহ্মি পুত্র ধর্ম।
পুত্র ধর্ম ন হএ করিতে হেন কর্ম॥

এইরূপে ধাত্রী তাহার দৌত্য-কার্যে ব্যর্থ হইলে, ইউসুফের নিকট জলিখা স্বয়ং প্রেম নিবেদন করিলেন। ইহাতেও বিশেষ ফলোদয় হইল না। জলিখা আবার তাঁহার ব্যর্থতার কথা ধাত্রীকে জানাইলেন। ধাত্রী জালিখাকে বলিলেন যে, ইউসুফ রমণী-সঙ্গম-অনভিজ্ঞ পুরুষ। সুতরাং, তাঁহাকে কাম-কলায় প্রলুব্ধ করিতে হইলে,—

তোহ্মা জথ সখী আছে নৌআলি জৌবন।
তা সব পাঠাই দেউ জাউ বৃন্দাবন।
ইছুফক বোলহ জাউ নিধুবনে।
তুলিআ আনউ পুষ্প তোহ্মার কারণে॥
অমাত্য কুমারী জথ রূপে কামাতুর।
লাস বেশ করি জাউ বৃন্দাবন পুর॥
জথেক নাগরীপনা কামাকুল রূপে।
ইছুফ ভুলাউ গিয়া সুরতি আলাপে॥

ধাত্রীর পরামর্শ অনুসারে কাজ করা হইল। ইউসুফের অজানিতে জলিখার সখীগণকে লাস-বেশ করাইয়া, ইউসুফকে ভুলাইবার পরামর্শ দিয়া, নগর বাহিরে 'বৃন্দাবনে' অর্থাৎ উদ্যান-বাটিকায় বিহার করিতে প্রেরণ করা হইল। পরে, ইউসুফও তথায় প্রেরিত হইলেন। জলিখার সখীগণ শুধু যে ছলাকলায় ইউসুফের কামোদ্রেক করিতে ব্যর্থ হইলেন, তেমন নহে, ইউসুফের মুখে তত্ত্বকথা শুনিয়া তাহারাও গলিয়া গেল। এই ব্যর্থতার কথাও ধাত্রীকে জানাইয়া জলিখা তাহার পরামর্শ চাহিলেন। ধাত্রী বলিল, চিন্তিত হইবার কারণ নাই; কেননা—

হেন এক মন্দির রচিব সুরচিত।
জীবন নক্ষত্র পুরিআ সমুদিত॥
ইছুফ জলিখা কেলি চিত্রে লিখি আর।
অঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গম যে বিবিধ প্রকার॥
ইছুফে দেখিয়া সেহি হৈব কামাতুর।
রতিসুখ কেলিরঙ্গে হৈব মতি ভোর॥

বলা বাহুল্য, ধাত্রীর পরামর্শ অনুসারে জলিখা এক 'মন্দির' অর্থাৎ গৃহ নির্মাণ করাইলেন। ইহারই নাম কামভাব উদ্রেকাত্মক "সপ্তখণ্ড-টঙ্গী"। জলিখা অপূর্ব সাজে সজ্জিতা হইয়া এই "সপ্তখণ্ড-টঙ্গীতে" গমন করিলেন। যথাসময়ে ইউসুফও তথায় নীত হইলেন। এইখানেই জলিখা ইউসুফকে যৌবন নিবেদন করিলেন। এবারও তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইউসুফ পলাইয়া গিয়া জলিখার কাম-কবল হইতে আত্মরক্ষা করিলেন। পলাইবার সময় বাধা দিতে গিয়া জলিখা ইউসুফের পিঠের কাপড় ধরিয়া ফেলিলেন। ইউসুফ পলাইয়া গেলেন বটে, জলিখার হাতে তাঁহার কাপড় ছিঁড়িয়া থাকিয়া গেল। জলিখা মুর্ছিতা হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। সখীগণের যত্নে তাহার মূর্ছাভঙ্গ হইল। চরম হতাশায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া জলিখা আজিজ-মিসরের নিকট ইউসুফের নামে নিজের সতীত্ব নাশের অপবাদ দিলেন। ইউসুফের বিচার হইল। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে অপবাদ অস্বীকার করিলেও, লজ্জায় সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে পারিলেন না। ফলে, তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

॥ ৬ ॥

(ক)

জলিখার অপবাদে ইউসুফের কারা-জীবন আরম্ভ হইল। তিনি খোদাকে স্মরণ করিয়া কারা-জীবনের কঠোর দিনগুলি একটির পর একটি করিয়া কাটাইয়া দিতে লাগিলেন; আর খোদাকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন :—

মোর জথ অপরাধ তোহ্মা পদগত।
এহি কথা সাচা মিছা করহ বেকত॥

এই সময় ইউসুফ এক 'অন্তরীক্ষ-বাণী' শুনিতে পাইলেন যে, জলিখা যখন তাঁহাকে অধর্ম-কার্যে লিপ্ত করিতে সচেষ্টা ছিলেন, তখন তাঁহার এক সখী পর্দার আড়ালে থাকিয়া তিন মাসের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে 'ঢুলনি' অর্থাৎ

দোলনায় রাখিয়া ঘুম পাড়াইতে ছিলেন। শিশুটি সবকিছু দেখিয়াছে ও আল্লার হুকুমে সে সাক্ষ্য দিবে।

এহেন 'অন্তরীক্ষ-বাণী' শ্রবণ করিয়া ইউসুফ আজিজ-মিসরের নিকট নিবেদন করিলেন যে, তিনি যে নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক সে-সম্বন্ধে এক সাক্ষী আছে এবং এই সাক্ষী হইতেছে জলিখার সখীর তিন মাসের নির্বোধ শিশু। আজিজ-মিসরের আদেশে জলিখা কোলে করিয়া এই শিশুকে লইয়া আসিলেন। এই কার্যে দোষ-গুণ কাহার,—এই কথা আজিজ-মিসর শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন; আর—

শিশু বোলে মুঞি নহোঁ নবির চরিত।
কার তরে কার বাক্য ন কহি বিদিত॥
জাহার অগ্রত ভাগে বিদার বসন।
তার কথা মিথ্যা জান প্রলাপ বচন॥
জার পৃষ্ঠগত বস্ত্র বিদার প্রমাণ।
সেহি সত্যবাদী ধর্মশীল অনুমান॥

শিশুর এই কথা শুনিয়া আজিজ-মিসর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখিলেন যে, ইউসুফের পৃষ্ঠের এবং জলিখার সম্মুখের বস্ত্র ছিন্ন। ইহাতে আজিজ জলিখাকে অনেক গঞ্জনা করিলেন বটে, কিন্তু ইউসুফকে উপদেশ দিলেন,—

তোহ্মার কর্তব্য কর্ম মুঞি ভাল জানোঁ।
তুহ্মিমাত্র কার ঠাঞি ন কহিবা আন॥

(খ)

এতৎসত্ত্বেও, জলিখার কেলেঙ্কারীর কথা গোপন রহিল না। দুঃসংবাদ যেমন বায়ুর আগে আগে উড়িয়া বেড়ায়, কলঙ্কের কথাও তেমন দেখিতে দেখিতে মুখে মুখে দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। ইহাতে জলিখা বিচলিতা হইলেন। লঙ্ক মোচনের উপায় সম্বন্ধে ধাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইল যে,

দেশের যাবতীয় যুবতী নারীকে নিমন্ত্রণ দিয়া একত্র করিয়া, এই রমণী-সমাজে ইউসুফকেও ডাকিয়া আনিতে হইবে। তখন তাহাদের সম্মুখেই ধাত্রী কু-চর্চা খণ্ডন করিবে। পরামর্শ অনুসারে কাজ করা হইল। দেশের যাবতীয় যুবতী নিমন্ত্রিত হইয়া রাজ-অন্তঃপুরে সমবেত হইলেন। তাহাদের জন্য নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য সরবরাহের আয়োজন করা হইল। ভোজনান্তে ফলাহারের জন্য তাহাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া 'তরুঞ্জা' নামে পরিচিত সে-দেশের সর্বোৎকৃষ্ট ফল এবং তাহা কাটিবার জন্য একখানা করিয়া 'খরশান কাতি' দেওয়া হইল। আহারের সুযোগ লইয়া যুবতীগণ বলিল, ইউসুফকে না দেখিলে তাহারা কিছুই খাইবে না। অগত্যা—

জলিখা আদেশ কৈল এক সখী তরে।
ইছুফক কহ গিআ আসউ সত্বরে॥

ইউসুফ আসিলেন না। পরিশেষে তাঁহাকে আনিবার জন্য জলিখাকেই যাইতে হইল। জলিখার অনুনয়ে ইউসুফ রমণীদের সভায় আগমন করিলেন। রমণীগণ তখন ফলাহার করিতেছিল। ইউসুফের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতেই, রমণীরা অত্মহারা হইয়া—

দেখিলেন্ত পরতেক কিবা এ স্বপন।
এক দৃষ্টে নেহালন্ত পাসরি আপন॥
হাতেত তরুঞ্জা ফল কাতি খরশান।
হস্ত সন্ধে ফল কাটে মনে নাহি আন॥
কেহো ফল কাটিতে অঙ্গুলি কাটি নিল।
কিবা কর কিবা ফল এক ন জানিল॥

হাস্য পরিহাসচ্ছলে জলিখা রমণী-সমাজে বলিলেন যে, বহু ধন দিয়া এই ক্রীতদাসকে কিনিয়া কত আদর যত্ন করিয়াছি; কিছুতেই সে আমার বশ্যতা স্বীকার করিল না। এইবার তাহাকে নির্জন কারাগারে বন্দী করা হইবে। রমণীরা ইউসুফের ভয়াবহ নির্জন-কারাবাসের কথা শুনিয়া সদয়

হৃদয়ে তাঁহাকে জলিখার বশীভূত হইতে উপদেশ দিলেন। ইউসুফ তাহাদিগকে অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন—

তিরীক সমাজ হোন্তে রাখম বান্ধি মন।
তিরী মুখ ন দেখি গোঙাম কত খন॥
লুবুধ ন হম মুঞি তিরী মুখ দেখি।
বন্দীত থাকম মুঞি এসব উপেখি॥

অতঃপর, ইউসুফ নির্জন-কারাগারে প্রেরিত হইলেন। এতৎসত্ত্বেও জলিখার মনে শান্তি রহিল না। একদা তিনি আজিজ-মিসরের আদেশ লইয়া নির্জন-কারাগারে গমন করিয়া ইউসুফের নিকট কামবাসনা তৃপ্তির প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব পূর্ববৎ সুদৃঢ়ভাবেই অগ্রাহ্য হইল। ইহাতে জলিখার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি অনুচরগণকে আদেশ করিলেন যে, তাহারা যেন ইউসুফের শরীর হইতে ভাল বস্ত্র ও আভরণ কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে অতি সাধারণ পোশাকে সাজাইয়া দেন। ফলে, জলিখার অনুচরেরা ইউসুফের—

আভরণ কনক লৈল ততখন।
লোহাক দাণ্ডুকা দিল অঙ্গক ভুষণ॥
গর্দভ পৃষ্ঠেত তানে চড়াইল ছলে।
নগরান্ত ইছুফক ফিরাইল বলে॥
ডাকোয়ালে ডাক ছাড়ে সকলে শুনিল।
এহেন দুর্জন দাস জলিখা কিনিল॥
অন্তঃপুর মধ্যে কর্ম দুষ্কৃতি রচিত।
ঈশ্বর ঘাতক মহাপাতকী বিদিত॥
এহি তার যোগ্য শাস্তি সর্বলোকে জান।
বন্দীর ভবনে তাক রাখহ সাবধান॥

ইহাতে ইউসুফের অপবাদ ঘোষিত হওয়া দূরে থাকুক, অধিকন্তু, তাঁহাকে দেখিবার জন্য সকলের ঔৎসুক্য বাড়িয়া গেল এবং বন্দীশালায় দলে দলে

লোক আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতে লাগিল। ইউসুফের দেবমূর্তি সন্দর্শনে সকলে বলাবলি করিতে শুরু করিল,—

শিষ্টজন কদাচিত তুষ্ট নাহি হএ।
কৃষ্ণ কালি দাগ ন জায়ন্তি শত ধোএ॥

ইউসুফ নির্বিবাদে আরও দশজন বন্দীর সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমনে বন্দীশালা 'চন্দ্রপুরে' পরিণত হইল। অন্যান্য বন্দীরা তাঁহাকে দাসের ন্যায় সেবা করিতে লাগিল। আসল ব্যাপারটি জানিতে পারিয়া সুখ শান্তি বৃদ্ধির জন্য গোপনে জলিখা—

ইছুফক দিলা জথ খাট পাট পাটি।
তুলি গদি বসন ভূষণ বাটা বাটি॥

ইউসুফের জন্য এত করিয়াও জলিখার মনের সাধ মিটিল না। তিনি মনের দুঃখে বনে না গিয়া রাজ-প্রাসাদে বসিয়াই এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন যে,—

ইছুফক পাদুকাএ জেহ্ন সেহ পতকাএ
আঁখির উপরে রাখি থাকোঁ।
খেনে খেনে নয়ানেত খেনে খেনে বয়ানেত
খেনে খেনে মস্তকে ধরাওঁ॥
নবীন নাগরী আহ রূপেত আগরী তাহ
জেহ্ন হওঁ পাগল চরিত।
পিউ জেহ্ন সুধাবিন্দু প্রেমলাভ ভাবসিন্ধু
হাকলি বিকলি করি রীত॥

বিলাপান্তে জলিখার মনের বেদনা জলভারমুক্ত মেঘের ন্যায় লঘুতা প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া কারান্তরালে লুক্কায়িত দয়িত-দর্শনে ছুটিয়া চলিল। একদা নিশীথে কারাকক্ষে ইউসুফের সহিত জলিখার দেখা হইল। জলিখা তাঁহাকে মনোবেদনা নিবেদন করিলেন। জলিখার মুখে তাঁহার মনোবেদনার কথা শুনিয়া ইউসুফও দুঃখিত হইলেন। এই

সময় রজনী ভোর হইয়া আসিতেছিল। আর কারাগারে অবস্থান করা সংগত মনে না করিয়া, জলিখা রাজ-অন্তঃপুরে ফিরিয়া গেলেন।

(ঘ)

এইভাবে জলিখার বিরহ-জীবনের আতপ্ত দিনগুলি যখন একে একে কাটিয়া যাইতেছিল, তখন এক দিন হঠাৎ আজিজ-মিসরের মৃত্যু হইল। ইহাতে জলিখার খুশী হইবারই কথা। কিন্তু, তিনি তাহা হইতে পারেন নাই। তাঁহার হৃদয়ে চিন্তার অবধি রহিল না: তিনি ভাবিলেন, হিতে যে বিপরীত হইল,—

দুক্ষের উপরে দুক্ষ দিল বিধি তার।
হস্ত হোন্তে দূর গেল রাজ্য অধিকার॥

আজিজ-মিসরের মৃত্যুর পর পূর্ব নরপতি মিসরের রাজা হইলেন। তিনি তখন কঠোরভাবে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজার দুই প্রধান অনুচর তাঁহার বন্দী হইয়া ইউসুফের সহিত বন্দীশালায় বাস করিতে লাগিল। কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। একদা বন্দীদ্বয় দুইটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখিল। স্বপ্ন দুইটি তাহারা ইউসুফের নিকট এই ভাবে বিবৃত করিল :—

ভুঞ্জন সামগ্রী সব থাল বাটি ভরি।
মস্তক উপরে রাখিনু হাতে ধরি॥
চিলে কাকে কাঢ়িআ খায়ন্ত শির পর।
এহি ভএ পাই মুঞি জাগিলুঁ সত্বর॥
আর একে বোলে স্বপ্ন দেখিলুঁ প্রভাতে।
সম্পূর্ণ কনক কাটোরা মোর হাতে॥
রহিআছোঁ নৃপতি অগ্রেত ভএ মন।
কহ মহাশয় এহি স্বপ্নের বাখান॥

ইউসুফ চট করিয়া উত্তর দিলেন: প্রথম ব্যক্তি যে স্বপ্ন দেখিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা এই যে, আগামী কল্য রাজা তাহার শিরশ্ছেদ করিবেন এবং দ্বিতীয়

ব্যক্তি যে স্বপ্ন দেখিয়াছে, তাহার মর্ম এই যে, বন্দী-জীবন হইতে সে অচিরে মুক্ত হইয়া রাজদ্বারে বহু সম্মান লাভ করিবে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই সময়ে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ইউসুফ অনুরোধ করিলেন যে, মুক্ত হইয়া রাজ সম্মান লাভ করিলে, ইউসুফের বিনাদোষে কারাবাস ভোগ করার বৃত্তান্তটুকু যেন সে রাজার গোচরীভূত করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। আকস্মিকভাবে ঠিক এই মূহূর্তেই ইউসুফ এক 'আকাশ বাণী' শুনিতে পাইলেন, "হে ইউসুফ! ঈশ্বরের উপর নির্ভর না করিয়া মানুষের কাছে স্বীয় মুক্তির জন্য অনুরোধ করিয়া তুমি অধর্ম করিয়াছ। ইহাতে ঈশ্বর তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং যতদিন তোমার বন্দী জীবন কাটিয়াছে, আরও ততদিন তুমি কারাগারে জীবন কাটাইবে।"

পরদিন প্রভাতে রাজার আদেশে প্রথম অনুচরটির শিরশ্ছেদ করা হইল এবং দ্বিতীয় অনুচরটি মুক্ত হইয়া রাজানুগ্রহ লাভ করিল বটে, কিন্তু সে তাহার মুক্তির আনন্দে আত্মহারা হইয়া, ইউসুফের সহিত যে-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার কথা বিল্‌কুল্ ভুলিয়া গেল। এইভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল।

এই সময়ে মিসর-রাজ এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখিলেন। পাত্র মিত্র সকলকে ডাকিয়া এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাওয়া হইল। কেহই স্বপ্নের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারিল না। তখন ইউসুফের কথা ঐ রাজ অনুচরটির মনে পড়িয়া গেল। সে নিজের স্বপ্নের ব্যাখ্যার কথা রাজাকে জানাইয়া কহিল যে, বন্দী ইউসুফ ব্যতীত আর কেহ এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন না। স্বপ্ন-ব্যাখ্যার জন্য ইউসুফকে সসম্মানে রাজসভায় লইয়া আসিতে রাজা অনুচরটিকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। যথাসময়ে ইউসুফকে রাজসভায় আনা হইল। রাজা তাঁহাকে স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন :—

সপ্ত বৃষ হৃষ্টপুষ্ট অতি সুবলিত।
আর সপ্ত বৃষ কৃষ তনু দুর্বলিত॥

খীনবল সপ্ত বৃষ বলবন্ত হৈআ।
এহি সপ্ত বৃষ খাইতে গেল জে ধাইআ॥
জেহ্ন ব্যাঘ্রে ঝম্প দিআ তাহাক ধরিল।
অহি সপ্ত পুষ্ট তনু বৃষক ভখিল॥
আর এক অপূর্ব দেখিলা নৃপবর।
সপ্ত ছড়া গোহোম গাছাইল মাটি পর॥
ছবজা বর্ণ সপ্ত ছড়া তেহেন সুরিত।
জেহেন চামর দোলে অতি সুললিত॥
তাহার নিয়ড় হোন্তে আর সপ্ত ছড়া।
গাছাইল তেহেন বর্জিত জেহ্ন মড়া!
সপ্ত ছড়া মরএ জানিল পূর্ণ ছড়া।
সেহি ক্ষণে শুখাইল জেহ্ন হৈল মরা॥

বর্ণনান্তে ইউসুফের কাছ হইতে রাজা তাঁহার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলেন। তখন ইউসুফ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করিলেন ও মিসর-রাজ তাহা এক মনে শুনিতে লাগিলেন। রাজাকে লক্ষ্য করিয়া ইউসুফ বলিলেন,—

দেখিলা যে সপ্ত বৃষ পুষ্ট অঙ্গ তার।
সপ্ত ছড়া গোহোম তণ্ডুল পূর্ণ আর॥
সেহি সপ্ত ছড়াত সংযোগ হৈব কাল।
সপ্ত অব্দ পৃথিবী পূরিত শস্য ভাল॥
আর সপ্ত বৃষ কৃষ তনু দুর্বলিত।
আর সপ্ত গোহোম জে তণ্ডুল বর্জিত॥
সেহি সপ্ত বরিখ দুর্ভিক্ষ হৈব কাল।
জলশূন্য পৃথিবী শুখাইব খাল নাল॥

মিসর-রাজ তাহার স্বপ্নের এহেন অদ্‌ভুত ব্যাখ্যা শুনিয়া, এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং দেশের কথা চিন্তা করিতে করিতে "নৃপতি দেখন্ত আগে নিজ মন হিত।"

॥ ৭ ॥

বলাবাহুল্য, ইউসুফকে ইতঃপূর্বে কারামুক্ত করিয়া মহাসম্মানে রাজ-সভায় আনা হইয়াছিল। স্বপ্ন-ব্যাখ্যার পর হইতে মিসর-রাজ দেশের মঙ্গল চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল,— সাত বৎসর দেশে যখন অসম্ভব ফসল ফলিবে, তখন দিন আনন্দেই কাটিয়া যাইবে। কিন্তু, পরবর্তী সাত বৎসর যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইবে, তখন কিভাবে দেশকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে, তাহার কোন-না-কোন উপায়-উদ্ভাবন একান্ত প্রয়োজন। তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে প্রতীতি জন্মিতে লাগিল যে, 'মহামতি ইউসুফ সর্বজ্ঞ'। পাত্র-মিত্রকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইল; তাঁহারাও ইউসুফের অতিমানবীয় প্রজ্ঞা সম্বন্ধে মিসর-রাজের সহিত এক মত হইলেন। যথাকালে এক সভা আহূত হইল। তখন,—

সভা সম্বোধিআ কহে মিছির ঈশ্বর।
শুন শুন মহাজন আহ্মার উত্তর॥
বৃদ্ধ হৈলুঁ পৃথিবীত পুত্র নাহি মোর।
অনুদিন এহি চিন্তা করোঁ মতি ভোর॥
মনে মনে জুকতি কল্পিআ কৈলুঁ সার।
ইছুফক দিমু এহি রাজ্যের অধিকার॥

যেই কথা সেই কাজ। প্রস্তাব মত কাজ হইতে কোন বিলম্বই করা হইল না। এই সভাতেই মিসর-রাজ সানন্দ-চিত্তে সদ্যঃকারামুক্ত ইউসুফকে —

আপনক ছত্র দিলা রত্ন সিংহাসন।
মাণিক্য রতন দিলা অঙ্গক ভূষণ॥

এইভাবে একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে ইউসুফ আজিজ-মিসর পদে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার নাম অচিরেই মিসরের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল। চারি-দিকে 'ধন্য ধন্য' পড়িয়া গেল।

ইউসুফ 'আজিজ-মিসর'-পদে বৃত হইয়াই রাজ্য-শাসনে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন, দেশে অপর্যাপ্ত শস্য ফলিয়াছে ; এই শস্য জমা করিয়া রাখিতে হইবে, যেন আসন্ন দুর্ভিক্ষের সময় লোক অনাহারে মারা না যায়। তিনি প্রতি-গ্রামে দুইটি করিয়া প্রকাণ্ড শস্যাগার নির্মাণ করাইয়া উপযুক্ত মূল্যে শস্য কিনিয়া তাহাতে জমা করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ মত কাজ চলিল। ধীরে ধীরে সরকারী-শস্যাগার সংগৃহীত শস্য-সম্ভারে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময়ে অপুত্রক মিসর-রাজের আয়ুর সপ্ততি বর্ষ পূর্ণ হইল। হঠাৎ এক দিন বৃদ্ধ রাজা পরলোক গমন করিলেন। অতঃপর, ইউসুফ অতি সহজেই মিসরের রাজপদ অলংকৃত করিলেন। তখন তিনি সসৈন্যে নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া স্বচক্ষে প্রজার অবস্থা অবলোকন করিতেন। তাঁহার দুই পার্শ্বেই বহু দেহরক্ষী (ছড়িদার) চলিত। এই সমস্ত—

ছড়িদার প্রতি আজ্ঞা কৈল নৃপবর।
তিরী জেহ্ন গোচর ন হএ মোর তর॥

॥ ৮ ॥

মিসরে ইউসুফ সুখ্যাতি ও সুবিচারের সহিত রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার রাজত্বে লোকের কোন অভাব অভিযোগ রহিল না। অথচ, জলিখার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি তখন প্রায় নির্বোধ ও উন্মাদ। এই সময়ে তাঁহার কাছে—

কেহ যদি ইউছুফক কহন্তি বারতা।
জেহি মাগে সেহি দেন্ত হইআ সম্মতা॥

সুতরাং, অচিরেই জলিখা ফতুর হইয়া গেলেন। অর্থাভাববশতঃ সমস্ত দাস-দাসীই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এমন কি, মাতৃতুল্যা ধাত্রীও তাঁহার মায়া কাটাইয়া পরলোক গমন করিল। শোকে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া তাঁহার

অবস্থা এমন হইল যে, তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, তিনি এখন এক অতি সামান্যা 'নগরুয়া নারী' মাত্র। হায়, একদিন—

জার কেশ সৌরভ সমীর সমুদিত।
আউল বাউল অতি কুভেস চরিত॥
জার দন্ত বিজুত চমকিত ছটফট।
দেখি দূর জাএ তার দশন বিকট॥
... ...
মিছিরের লোক সভে বিসরিল তারে।
বহুল বরিখ হৈল কোহ্নে পুছে কারে॥

তথাপি, ইউসুফ যেই পথ দিয়া যান, জলিখা সেই পথের পার্শ্বে বাসা বাঁধিয়া রাত্রিদিন সেখানেই বসিয়া থাকেন। কিন্তু, 'ছড়িদারেরা' পূর্ব আদেশ-অনুসারে জলিখাকে ইউসুফের দৃষ্টির বাহিরে রাখিবার জন্য অন্যত্র সরাইয়া দিতে লাগিল। জলিখার সহিত আজিজ-মিসর অর্থাৎ মিসর-রাজ ইউসুফের আর কোন মতেই দেখা হয় না।

একদিন তাঁহার বাসায় বসিয়া ইউসুফের চিন্তায় জলিখা বিনিদ্র-রজনী কাটাইতেছিলেন। তিনি যে-দেবতার আরাধনা করিতেন, তাহার এক প্রস্তর-মূর্তিও সঙ্গে ছিল। হঠাৎ ইহাকে পূজার বেদী হইতে নীচে নামাইয়া আনিয়া জলিখা বলিলেন,—

পাষাণ ভাঙ্গিয়া আজি করিমু চৌখণ্ড।
ব্যর্থে সেবা কৈলুঁ তোক জানিলুঁ তু ভণ্ড॥

বিরহ-বেদনা ও মর্মপীড়ায় জলিখার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি প্রতিমা-পূজায় বিশ্বাস হারাইলেন এবং যেই অদৃশ্য পরমেশ্বরকে ইউসুফ পূজা করেন, তৎপ্রতি আস্থাপরায়ণা হইয়া—

প্রতিমাক পাছাড়িআ কৈল খণ্ড খণ্ড।
ভূমি তলে খেপি তাক কৈল লণ্ডভণ্ড॥

কান্দিআ পশ্চিম দিকে করিলেন্ত মুখ।
পরম ঈশ্বর সেবা করেন্ত মন সুখ॥
পরম ঈশ্বর তরে নিবেদন বাত।
কহিতে রজনী শেষ হইল প্রভাত॥

বলাবাহুল্য, ইহা দুঃখের ঘোর তমসাচ্ছন্ন-রজনীর অবসানে জলিখার সুপ্রভাত। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালা এই রজনীতেই তাঁহার তওবা কবুল করিয়া তাঁহার সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটাইলেন। এখন হইতেই তাঁহার দিন ফিরিল।

॥ ৯ ॥

প্রভাতে আজিজ-মিসির ইউসুফ নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে মাত্র অল্প সংখ্যক সৈন্য ছিল। 'ছড়িদারদের' মধ্য হইতে কেহই সেই দিন তাঁহার শরীর রক্ষিরূপে নগরে বাহির হয় নাই। মিশরের রাজপথেও তখন অধিক সংখ্যায় লোক সমাগম হয় নাই। ইউসুফ যখন এইভাবে জলিখার বাসা-বাড়ির পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন—

আস্তে ব্যস্তে জলিখা পন্তে দণ্ডাইআ।
আজিজক তরে কহে প্রাণ উপেক্ষিআ॥
শুনরে আজিজ তুহ্মি কর অবধান।
জেহি বিধি কৈল তোক ভুবন প্রধান।
দাস হোন্তে আজিজ মিসির কৈলা তোরে।
তাহার শপথ জদি নাহি দেখ মোরে॥

ইউসুফ ফিরিয়া দেখিলেন, এক দীন-দরিদ্রা বৃদ্ধা তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতেছে। ভিখারিণীর কাতর আর্তনাদে ইউসুফের মন গলিয়া গেল। তিনি এক অনুচরকে আদেশ দিলেন যে, বৃদ্ধা যাহা চাহে তাহা যেন তাহাকে দিয়া দেওয়া হয়। ইহার কোন ব্যত্যয় ঘটিলে, তাহার কঠোর শাস্তি হইবে। ভয়ে জলিখার প্রতি ছুটিয়া গিয়া,—

অনুচরে বুলিলেক শুন বুঢ়া মাই।
জথ ধন চাহ তুহ্মি দিমু তোহ্মা ঠাঁই॥
বৃদ্ধাএ বোলএ শুন পুত্রতুল্য তুহ্মি।
কিছু ধন কড়ি তোহ্মা ন মাগিএ আহ্মি॥
মোক নিআ আজিজক করাঅ দর্শন।
আপনার নিবেদন করিমু আপন॥

বৃদ্ধা কিছুতেই কোন অর্থ গ্রহণ করিল না। অনুচরটি মহাবিপদে পড়িয়া অগত্যা বুড়ীর পীড়াপীড়িতে তাহার সহিত ইউসুফের সাক্ষাৎকার ঘটাইয়া দিতে রাজী হইল। যথাসময় ইউসুফ রাজ-প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া অন্তঃপুরে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। এই সুযোগে অনুচরটি বৃদ্ধাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিল। বৃদ্ধাকে দেখিয়া ইউসুফ বিরক্ত হইলেন ও তাহার নিকট বৃদ্ধার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন—

বুঢ়ী বোলে শুনহ আজিজ সুবদন।
একেবারে তুহ্মি আহ্মা হৈলা বিসরন॥
... ...
তোহ্মার কারণে মোর এথেক আবথা।
শেষ মাত্র জীবন আছএ মন ব্যথা॥

সত্যই ইউসুফ জলিখার কথা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। বুড়ীর কথা শুনিয়া আকস্মিকভাবে সমস্ত কথা তাঁহার মনে পড়িল। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

আস্তে ব্যস্তে আসন ত্যজিলা মনে গুণি।
তুহ্মি নি জলিখা বিবি তৈমুছ নন্দিনী॥
সাচা নি জলিখা বিবি কহ সত্য করি।
এথ কাল কোথাত আছিলা একসরি॥

এই বলিয়া ইউসুফ অতর্কিতে জলিখার সম্মানার্থে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং প্রকাশ্যে সমস্ত অতীত-স্মৃতি রোমন্থন করিয়া প্রবোধ দিতে দিতে,

জলিখাকে তাঁহার নিকট অসংকোচে মনের ভাব প্রকাশ করিতে বলিলেন। জলিখা মরিয়া হইয়া ইউসুফকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিকট প্রথম বর প্রার্থনা করিলেন :—

তুহ্মি ভক্ত পরম ঈশ্বর মনোগত।
বর মাগ হউ আহ্মা নয়ন মুকত।

যথাবিধি বর মাগা হইল। জলিখা তৎক্ষণাৎ চক্ষুষ্মতী হইলেন। অমনি, ইউসুফের চেহারার প্রতি জলিখার দৃষ্টি পড়িতেই, তাঁহার মূর্ছা হইল। ইউসুফ শশব্যস্ত হইয়া নিজের হাতেই তাঁহাকে ব্যজন করিয়া সুস্থ করিলে পর, তাঁহার অন্য কোন প্রার্থনা থাকিলে জলিখাকে তাহাও নিবেদন করিতে বলিলেন। তাই, আবার—

জলিখা বোলন্ত শুন আজিজ স্বরূপ।
সপ্তখণ্ড টঙ্গীতে আছিল জেহি রূপ॥
সেহি রূপ যৌবন মোর পুনি দেউ বিধি।
তোহ্মার প্রসাদে হউ মনোরথ সিদ্ধি॥

জলিখার এই দ্বিতীয় প্রার্থনা শুনিয়া ইউসুফ আল্লার কাছে দোয়া করিলেন যেন জলিখাকে এই বর দেওয়া হয়। প্রার্থিত বর তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করা হইল,— দেখিতে দেখিতে জলিখা তাঁহার বিগত-যৌবন ফিরিয়া পাইলেন। তারপর, ইউসুফ জলিখাকে "পুছিলেন্ত কহ আর আছে কি বাঞ্ছিত"। জলিখাও ছাড়িবার পাত্রী নহেন। এইবার শেষ বাসনা জ্ঞাপন করিতে গিয়া—

কন্যা বলে তোহ্মা পদতলে মোর ছায়া।
নিশি গোঙাইতে চাহোঁ লুবুধিত কায়া॥
... ...
ডুবিলুঁ বিরহ সিন্ধু ঢেউএ পোড়ে মন।
পদ অবলম্ব মোর রাখহ জীবন॥

এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া ইউসুফের মাথা হেঁট হইয়া গেল। তিনি অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এই সময়ে আকাশ হইতে এক ফেরেশতা অবতরণ করিয়া ইউসুফকে জানাইল যে, জলিখা ইউসুফের ধর্মপত্নী এবং তিনি যেন তাঁহাকে বিবাহ করেন।

॥ ১০ ॥

এতদিনে ইউসুফের নিকট সমস্ত ব্যাপার খোলসা হইল। তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন যে, জলিখাকে তাঁহার বিবাহ করিতে হইবে। কেননা, ইহাই খোদা তায়ালার হুকুম। বলা বাহুল্য, 'অন্তরীক্ষ-বাণী' লাভ করিয়া ইউসুফ পাত্রমিত্রকে ডাকিয়া এই সংবাদ দিয়াছিলেন। পাত্রমিত্রেরাও ইহাতে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইউসুফ তাঁহাদিগকে জলিখার সহিত তাঁহার শুভ-পরিণয়ের আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। ফলে, যথারীতি এই বিবাহের মহা-আয়োজন চলিল,—

শুভক্ষণে চন্দ্রাতপ তুলিলেক রঙ্গে।
ধর্মরি (?) পতাকা তুলিলা ধ্বজ সঙ্গে॥
জথ বাদ্য ভাণ্ড আছে সর্ব রাজ্য দেশ।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে পুরিআ বিশেষ॥
ঢাক ঢোল দণ্ডী কাঁসী দুন্দুমি নিশান।
মন্দিরা মাদল ভাল তবল বিষাণ॥
দোসরি মোহরি বাজে মৃদঙ্গ বহুল।
শঙ্খনাদ সিঙ্গা ভেরী বাজএ তম্বুল॥
জয়তুর শরমণ্ডল যন্ত্রতন্ত্র পুর।
নৃত্যগীতে নৃত্যক নাচএ জেহ্ন শূর॥
ঝনঝনি ঝাঁঝরি ঝুমুরি ঝনাকার।
বাঁশী কাঁশী চৌরাশী বাজন অনিবার॥
সানাই বর্গোল বাজে ভেউর কর্ণাল।
করতাল মন্দিরা বাজএ সুমঙ্গল॥

বিপঞ্চী পিণাক বাজে অতি মৃদুস্বর।
কপিলাস রুদ্র বাজএ নিরন্তর॥
বিদ্যাধরী কুমারী নাচএ নানা ছন্দে।
সুর সিন্ধু শৃঙ্গার মদন রস বন্দে॥
সুরপুরী জিনিআ আজিজ পুরী সাজ।
বহুল নৃপতি আসি ভরিল সমাজ॥

এইরূপে ইউসুফের সহিত জলিখার বিবাহ সাড়ম্বরে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গেল। অতঃপর, তাঁহারা মহানন্দে বাসর যাপন করিলেন। নবদম্পতিরূপে বসবাস করার জন্য ইউসুফ-জলিখা অন্তঃপুরে এক সুরম্য টঙ্গী রচনা করিলেন। ইহার নাম রাখা হইল 'উদয়-মঙ্গল'। এই প্রমোদ টঙ্গীতেই পর পর তাঁহাদের দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। দেশের নিয়ম-অনুসারে ধাত্রীর হাতে সন্তান দুইটির লালন-পালনের ভার পড়িল। তাই,—

ধাঞি সবে ছাওয়াল পালএ মহানন্দ।
দিনে দিনে বাঢ়ে জেহ্ন দুতিয়ার চান্দ॥

এই সময়ে ইউসুফের রাজত্বের শস্যপূর্ণ প্রথম সাত বৎসর পূর্ণ হইল। অষ্টম বৎসরে দেশে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ প্রকট হইয়া দেখা দিল। এই দুর্ভিক্ষ শুধু মিসরে সীমাবদ্ধ রহিল না। পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ফলে,—

মিছিরের বড় বড় জথ পুষ্করিণী।
শুখাই পড়িল সব জেহ্ন সে মেদিনী॥
বরিষাএ মেঘ নাই বরিখিতে জল।
শুখাইল খাল নাল জেহ্ন ভূমি থল।

দুর্ভিক্ষের প্রথম বৎসরে মিসরের লোক ধান্য বেচাকিনা করিয়া দুর্ভিক্ষের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিল; দ্বিতীয় বৎসরে মালমাত্তা বিক্রয় করিয়া প্রাণ বাঁচাইল; তৃতীয় বৎসরে কাহারও কাছে আহারের জন্য এক কণা শস্যও অবশিষ্ট রহিল না। এইরূপ অনন্যোপায় হইয়া মিসরের লোক ইউসুফকে কহিল,—

ভক্ষ্য দিআ কিন আহ্মা পুত্র পরিজন।
দাস দাসী করিআ রাখহ প্রাণধন॥

ইউসুফ পূর্ব-সঞ্চিত শস্য-ভাণ্ডারের দ্বার একে একে খুলিয়া দিতে লাগিলেন। মিসরবাসীরা সরকারী শস্য-ভাণ্ডার হইতে বিনামূল্যে জীবন-ধারণের উপযোগী শস্য লাভ করিয়া আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল। ইহাতে মিসরের লোক কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইউসুফের দাস-দাসী তুল্য হইয়া গেল। ইউসুফ খোদার কাছে প্রার্থনা করিলেন—

বৃদ্ধ নবী মোর বাপ আছে মহা দুখী।
মোহোর বিচ্ছেদে কান্দি হৈছে অন্ধ আঙ্খী॥
কৃপা কর তান মোর হউ দরশন।
অন্ধজন জেহ্ন পাউ ফিরিয়া নয়ান॥

তখন আকাশ-বাণী হইল, "হে ইউসুফ নিশ্চিন্ত হও, অবিলম্বে তোমার সহিত তোমার পিতার দেখা হইবে।"

ক্রমেই, ঘোরতর দুর্ভিক্ষে মিসর ও তৎচতুষ্পার্শ্ববর্তী সকল দেশের অবস্থা সংকটাপন্ন হইয়া পড়িল। শাম-রাজ্যের কেনান (কনয়ান) গ্রামে এয়াকুব নবী ও তাঁহার দশ পুত্র বাস করিতেন। এই শাম-দেশও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইল না। এই সময় এয়াকুব নবীর দশ পুত্র শস্যের অন্বেষণে মিসরে আসিল। ইউসুফ তাহাদের পরিচয় লইলেন ও নিজের পরিচয়টি গোপন রখিয়া তাহাদিগকে পরম সমাদরে আপ্যায়িত করিলেন; আর প্রচুর শস্য ও গোপনে তৎসহ শস্যের মূল্য ফেরত দিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। বিদায়-কালে বলিলেন যে, তাহারা যদি শস্য-আহরণে পুনরায় মিসরে আসে, তখন যেন তাহাদের সর্বকনিষ্ঠ ভাই বনী আমীনকে সঙ্গে লইয়া আসে। তাহা হইলে, তাহাদিগকে আরও অধিক শস্য দেওয়া হইবে। এয়াকুব নবীর পুত্রগণ স্বদেশে ফিরিয়া—

ধান্যের জথেক গুনি করন্ত মুকত।
তাহার অন্তরে ধন দেখন্ত বেকত॥

ইহাতে তাহারা আশ্চর্য হইয়া গেল। অনেক কল্পনা-জল্পনা ও আলাপ আলোচনার পর স্থির হইল, মিসর-রাজ এক মহাজন ব্যক্তি, তাঁহার ধনের কোন অন্ত নাই, প্রয়োজনও নাই; এত ধন দিয়া তিনি কি করিবেন? এই জন্যই তিনি 'গুনি' অভ্যন্তরে সংগোপনে শস্যের প্রদত্ত মূল্য ফেরত দিয়াছেন।

এই ঘটনার পরে পরেই, কিছুদিনের মধ্যে এয়াকুব নবীর পুত্রগণ তাহাদের কনিষ্ঠ ভাই বনী আমীনকে সঙ্গে লইয়া আবার শস্য সংগ্রহ করিতে মিসরে গমন করিল। এইবারও তাহারা পূর্বের ন্যায় মিসরে সমাদরে গৃহীত হইল ও রাজগৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া ইউসুফের সহিত আহার করিল। এই-খানেই একান্তে রাজ-অন্তঃপুরে বনী আমীনের সহিত ইউসুফের পুনর্মিলন ঘটিল। তখন ইউসুফ তাঁহাকে গোপনে বলিয়া দিলেন যে,—

ভাই সব সঙ্গে জাইতে তোহ্মাক ন দিমু।
সঙ্কেত সন্ধান করি তোহ্মাক রাখিমু॥
কনকের এক কাটা ধান্য মাপি দিতে।
তোহ্মার গুনির মাঝে রাখিব গোপতে॥
ফিরাই আনিব পাই অনুচর সব।
তবে ভাই সব মেলে ন হৈব রৌরব॥

এই পরামর্শ অনুসারে কাজ হইল। শস্য লইয়া এয়াকুব নবীর পুত্রগণ শাম-দেশাভিমুখে রওয়ানা হইল। মিসরের সীমা অতিক্রম কালে বিদেশীয়-দের সকলের খানাতল্লাশী হইতেছিল। এয়াকুব নবীর পুত্রগণেরও খানাতল্লাশী শুরু হইল। এই সময়ে বনী আমীনের শস্যের 'গুনিতে' স্বর্ণনির্মিত ধান্যের 'কাটা' পাওয়া গেল। ফলে বনী আমীনকে চোররূপে রাজদ্বারে চালান দেওয়া হইল এবং অপর ভাইদিগকে শাম-দেশে শস্য লইয়া চলিয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইল। ভ্রাতৃগণ ইউসুফের নিকট বনী আমীনের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ইউসুফ ক্ষমা করিলেন না, বরং বলিলেন যে, তিনি একটি "পাখরিয়া অশ্ব" বৃদ্ধ-নবীকে আনিবার জন্য দান করিতেছেন; নবী না আসিলে বনী আমীনকে ছাড়া হইবে না।

অগত্যা নবীর পুত্রগণ পিতাকে মিসরে আনিবার জন্য "পাখরিয়া অশ্ব" লইয়া শামদেশে ফিরিয়া গেল। যথাসময়ে পিতাকে সঙ্গে লইয়া পুত্রগণ মিসরে রওয়ানা হইল। যখন তাহারা মিসর-সীমান্তে পৌঁছিল, পিতাকে অভ্যর্থনা দান করিবার জন্য আজিজ-মিসর ইউসুফ সপারিষদ ও সসৈন্য সীমান্ত-অভিমুখে রওয়ানা হইলেন; আর—

অন্তঃপুর নারীগণ পুষ্পবৃষ্টি অনুক্ষণ
আজিজ অগ্রত নানা ভাতি।
ধন্য ধন্য বোলে লোক শুনিআ শ্রবণ সুখ
আজিজ মিছির শুদ্ধমতি॥

অন্তঃপুর-চারিণীদের শুভেচ্ছাজ্ঞাপক 'পুষ্পবৃষ্টি' মাথায় লইয়া ইউসুফ পিতৃসংবর্ধনায় রাজধানী ত্যাগ করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া মিসরের লোক আনন্দে আত্মহারা হইলেন। সাত দিন পথ চলার পর, ইউসুফ যখন মিসর-সীমান্তে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি পাত্র-মিত্র সকলকে সম্বোধন করিয়া আদেশ দিলেন—

রথ হোন্তে লামহ জথ রথ রথিগণ।
পদে হাঁটি দেখি গিআ বাবার চরণ॥
চলিলেন্ত সৈন্য সব পদরথি হৈআ।
নৃপ সঙ্গে চলে সব আনন্দে পুরিআ॥

সীমান্তেই পিতাপুত্রে মিলন হইল। তাঁহারা আনন্দে অধীর হইলেন ও মিসরের রাজপুরী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। পথ চলিতে চলিতে নীল নদের তীরে উপস্থিত হইলে, ইউসুফ পিতাকে বলিলেন যে, এই নদীতে স্নান করিলে অধিক পুণ্য লাভ হয়। তখন এয়াকুব নবী নীল-নদের জলে স্নান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন, এবং—

সেহি পদ পরশনে নীলে পাইল মুক্তি।
সেহি জল বর্ণ হৈল দুধের আকৃতি॥

যথাসময়ে পিতাপুত্র রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুচর দ্বারা জলিখার কাছে সংবাদ পাঠাইয়া দেওয়া হইল যে, যেন "জলিখা আসউ

শীঘ্রে মঙ্গল-বিধান" করিতে। অমাত্য-কুমারীদের কাহারও হাতে দুর্বা, কাহারও হাতে ধান ও কাহারও হাতে নানা পুষ্প লতা দিয়া, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া—

নানা দ্রব্য সঙ্গে করি মঙ্গল-বিধান।
আইলা জলিখা বিবি সভা বিদ্যমান॥
সর্বতনু বসনে ঢাকিআ আস্যী মুখ।
নবীর চরণ বন্দে মনে বাসী সুখ॥
অমাত্য রমণীগণে হৈলা দণ্ডবত।
স্বর্গ হোন্তে ইন্দ্রাণী আইলা জেহ্ন মত॥

নবী একে একে সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। জলিখাকে পুত্রবধূ-রূপে পাইয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে লইয়া গিয়া সুবর্ণ-বেদিকায় স্থাপিত এক রত্ন-সিংহাসনে বসানো হইল। চারিপাশে দাঁড়াইয়া অনুচরগণ চামর দোলাইতে দোলাইতে বাতাস করিতে লাগিল। তখন—

জলিখাক আদেশ করিলা নৃপবর।
কনক ভিঙ্গার ভরি আনহ সত্বর॥
বাপপদ আপনে পাখালে নৃপমণি।
জলিখাএ জল ঢালে অবিরত পুনি॥
পাখালি নবীর পদ নির্মল করিলা।
জলিখা মস্তক কেশে উপস্কার কৈলা॥

... ...

পুত্রক বুলিলা তবেঁ জলিখা সুন্দরী।
সম্মুখে দণ্ডাই রহ পদ অনুস্মরি॥

বনী আমীনও আসিয়া পিতার সহিত মিলিত হইলেন। ইউসুফের দশ ভাই এই সময়ে 'উদয়-মঙ্গল'-টঙ্গীতে বিশ্রাম করিতেছিলেন। পিতাকে

পরম যত্নে আদর আপ্যায়ন করিয়া, বনী আমীন সহ তাঁহাকে এই টঙ্গীতে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। তথায় ইয়াকুব নবী, তাঁহার দ্বাদশ পুত্র, দুই নাতি ও এক পুত্রবধু লইয়া আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

মিসরাধিপতি ইউসুফ আবার রাজ্য-শাসনে মনোনিবেশ করিলেন। এইবার তিনি তাঁহার বড় ভাইকে মুখ্যপাত্র করিলেন ; অপর ভাইদিগকেও যথোপ-যুক্ত রাজকার্যের ভার দেওয়া হইল। তাঁহার সুশাসনে রাজ্যে কাহারও অভাব-অভিযোগ রহিল না। যখন—

হেন মতে সপ্তম বরিখ গঞি গেল।
রাজ্যের দুর্ভিক্ষ নাহি শুভ দশা ভেল॥

দুর্ভিক্ষান্তে ধরিত্রী পুনরায় শস্যশ্যামলা হইল। মিসরেও পুনরায় পূর্ববৎ শস্য ফলিতে লাগিল। এইরূপে দেশে সুখ-শান্তি ফিরিয়া আসিলে, ইউসুফ তাঁহার পুত্রদ্বয়ের বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক করিবার জন্য জলিখার সহিত পরামর্শ করিলেন। ঠিক হইল যে—

মহাসাধু আছএ বারহা তান নাম।
তান কন্যা রূপবতী আছএ অনুপাম॥
সেহি কন্যা ইছুফক জ্যেষ্ঠপুত্র লাগি।
বিবাহ নির্বন্ধ কৈলা মন অনুরাগি॥
পরিণয় কৈলা নৃপ পুত্র সমাহিত।
মণিরত্ন কাঞ্চন ভূষিত কৈল নিত॥
আর এক নৃপতি আমির তান নাম।
চীন রাজ্যে নিবাসন্ত মহিমা উপাম॥
সেহি রাজ কন্যা এক রূপেত পার্বতী।
ত্রিভুবনে তান সম নাহি রূপবতী।
সেহি কন্যা ছোট পুত্রে কৈলা পরিণয়।
রাজ্য সন্ধে কন্যা দান কৈলা মহাশয়॥

অতঃপর, স্ত্রী-পুত্র ও পরিবার-পরিজন লইয়া ইউসুফ সুখে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে যাঁহাকে যে

রাজকার্যের ভার দেওয়া হইয়াছিল, তিনি সে-কাজ অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত সমাধা করিতেছিলেন। মিসর-রাজ্যে শান্তি-সুখের অবধি রহিল না।

॥ ১১ ॥

এই সময়ে একদিন মিসর-রাজ ইউসুফের দিগ্বিজয়ে বাহির হইবার বাসনা হইল। পিতা এয়াকুব নবী পুত্রের এই বাসনার কথা জানিতে পারিয়া উপদেশ দিলেন যে, ইউসুফ যেন দিগ্বিজয়ে বাহির হইবার পূর্বে খোদার কাছে প্রার্থনা করিয়া নিজের মনোবাঞ্ছা জানাইয়া দেন। ইউসুফ তাহাই করিলেন। প্রার্থনান্তে দূতবর জিব্রাইল তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে,—

প্রভু আজ্ঞা হৈল তুহ্মি সর্ব রাজ্য-জিন।
কাফির সকল মারি করহ অধীন॥
মহামন্ত্র কলিমা ন কহে জেহি জন।
তাহার উপরে কর অস্ত্র বরিষণ॥

স্বর্গীয় দূতমুখে এই সংবাদ শুনিয়া ইউসুফের পূর্ব-সংকল্প সুদৃঢ় হইল। তিনি পাত্রমিত্রগণকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহাদিগকে তাঁহার দিগ্বিজয়-বাসনার কথা জানাইয়া দিলেন। অতঃপর, মিসরের সেনা-বিভাগে 'সাজ-সাজ' রব পড়িয়া গেল। কারণ, আদেশ দেওয়া হইল—

সুসজ্জ করহ সৈন্য জথ অশ্ববর।
সুবর্ণ কুমিজ জিন চড়াঅ পাখর॥
জথেক পদাতিগণ রণেত জুঝার।
তা সভাক দেঅ আনি রত্ন অলঙ্কার॥
মহাবলি সেনা সব সমরে তুখড়।
সিংহ সম পরাক্রম হাতে ধনুশর॥
... ...
গজ বাজী রথ ধ্বজ পতাকা সুসাজ।
চতুরঙ্গ সেনা সাজে নৃপতি সমাজ॥

এইরূপে এক সুসজ্জিত প্রবল-বাহিনী গঠন করিয়া, ইউসুফ তৎসহ দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। তিনি যেই দিকে গমন করিলেন, সেই দিকই ভয়ে থরহরি কম্পিত হইয়া উঠিল। তথাকার রাজন্যবর্গ আজিজ-মিসর ইউসুফের সহিত বিবাদ এড়াইয়া, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়া, মনের আনন্দে তাঁহার সহিত দিগ্বিজয়ে চলিলেন। অধিকন্তু, রাজ-রাজড়ারা—

সুবর্ণ মণ্ডিত ছত্র শির পরে ধরি।
চারি পাশে চামর দোলাএ সারি সারি॥
কোহ্ন রাজা সঙ্কে কভো ন করিল রণ।
সব রাজা আজিজক পশিল শরণ॥

এইভাবে ইউসুফ দিগ্বিজয় করিয়া চলিলেন। অবশেষে তিনি 'সুবর্ণপুর' ('সোনার গাঁও' কি?) নামক নগরে প্রবেশ করিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, আর—

সৈন্য আধিকারী দিলা পাত্র একজন।
ইবিন আমিন ভাই আপনা ভবন॥

এইস্থানে বিশ্রাম কালে ইউসুফ একদিন প্রভাতে মৃগয়ায় বাহির হইলেন। পথে এক বনে এক অপূর্ব জন্তু দৃষ্টিগোচর হইল। ইউসুফ জন্তুটিকে ধরিতে তৎপ্রতি অশ্ব-ধাবন করিলেন। আর, জন্তুটি প্রাণরক্ষার্থে অরণ্যের অভ্যন্তর ভাগে অনেকদূর চলিয়া গেল। জন্তুর পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে ইউসুফ কাতর হইয়া পড়িলেন। তথাপি তিনি—

পন্থের নির্গম ন পারন্তি লখিবার।
ন জানি কি গতি হয় অরণ্য ভিতর॥

ইউসুফ বনে পথ হারাইয়া যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন মধ্যাহ্ন কাল। পরিশ্রমে তাঁহার অশ্বের মুখে ফেনা বাহির হইতেছিল ও তৃষ্ণায় তাঁহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। এই সময়ে অদূরে বনমধ্যে "আচম্বিতে শুনে রাজা হংসের কল্লোল"। নিকটেই জল আছে মনে করিয়া ইউসুফ

সেই দিকে অশ্ব ধাবিত করিতেই দেখিতে পাইলেন যে, তথায় এক দিব্য সরোবর বিদ্যমান। এই সরোবরে জল টলমল করিতেছিল এবং তাহাতে—

পদ উতপলে ক্রীড়ে হংস চক্রবাক।
নানা পক্ষী কেলি রঙ্গে আছে লাখে লাখ॥
... ...
সেহি জলে নামি নৃপ অঙ্গে পাখালিলা।
তীরে উঠি বসন ভূষণ বিভূষিলা॥
ঘোটক আনিলা শীঘ্রে জল পান দিলা।
জলেত লামাই অশ্ব সিনান করাইলা॥

অতঃপর, এই সরোবর-তীরে শীলাসনে বসিয়া তিনি বিশ্রাম করিতেছিলেন। এই সময়ে সরোবরের পশ্চিম দিকস্থ অরণ্য হইতে সুললিত সংগীত ভাসিয়া আসিতে লাগিল। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে পর, তিনি তথায় এক সুরম্যপূরী দেখিতে পাইলেন এবং আরও দেখিতে পাইলেন—

তার মধ্যে এক কন্যা রত্ন সিংহাসনে।
তান সম রূপ নাহি এ তিন ভুবনে॥

ইঁহার নাম বিধুবতী বা বিধুপ্রভা। তিনি তখন মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির জন্য মহেশ-দেবতার পূজায় ব্যস্ত ছিলেন। পূজা সারিয়া তিনি নবাগত অতিথি ইউসুফকে আদর আপ্যায়নে তুষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যেখানে কাহারও আসিবার শক্তি নাই, তিনি কিভাবে সেখানে আসিলেন এবং তিনি কে? ইউসুফ তাঁহার পরিচয় দিলে কুমারী বলিলেন যে, "মনোরথ সিদ্ধি এবে কৈল নিরঞ্জন"। তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহাকে এক নবীপুত্র স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার মত রূপবান পুরুষ তিনি কখনও দেখেন নাই। তিনি তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট বাঞ্ছিতকে না পাইয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করিতে চাহিলে এক আকাশ-বাণী শুনিতে পাইলেন,—

ন মরিঅ আএ কন্যা তুক্ষিত হৃদয়।
তোহ্মার মানস আহ্মি পুরিব নিশ্চয়॥

এই প্রসঙ্গে কন্যা বিধুপ্রভা এই বলিয়া ইউসুফকে জানাইলেন যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটায়, তিনি বুঝিতে পারিতেছেন যে, তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। বিধুপ্রভার এহেন উক্তি শুনিয়া—

আজিজ বোলন্ত শুন রাজার নন্দিনী।
জার মুখে স্বপ্নে তুহ্মি দেখিলা আপনি॥
তাহান বৃত্তান্ত আহ্মি জানি ভালমতে।
কহিব তোহ্মাত আহ্মি সর্ব কথা তত্ত্বে॥
আহ্মার কনিষ্ঠ ভাই ইবিন আমিন।
জার লাগি মনস্তাপ ভাব রাত্রিদিন্॥

এই কথা শুনিয়া বিধুপ্রভা ইউসুফের পদস্পর্শ করিয়া পদধুলি গ্রহণ করিলেন। ইউসুফ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে। ইউসুফের কথায় আশ্বস্ত হইয়া,—

আজিজ প্রণাম করি বোলে বিধুবতী।
মোর বাপ রাজ্যেত আইস মহামতি॥

আজিজ-মিসর ইউসুফ বিধুবতী বিধুপ্রভার এই আবেদনে সাগ্রহে সাড়া দিলেন। অতঃপর, তিনি অশ্বে ও বিধুপ্রভা রথে আরোহণ করিয়া কন্যার উদ্দিষ্ট পিতৃপুরীতে যাত্রা করিলেন। এই রাজপুরীর নাম 'মধুপুরী'। ইহা বিধুপ্রভার পিতার রাজধানী। যাত্রান্তে ইউসুফ ও বিধুপ্রভা—

অবিলম্বে পাইল গিআ সেহি মধুপুরী।
জিনিআ অমরাপুর রাজার উয়ারী॥

মধুপুরীতে (ভাওয়ালের অন্তর্গত মধুপুর কি ?) পৌঁছিয়াই, বিধুবতী-বিধুপ্রভা রথ হইতে অবতরণ করিয়া পিতৃমাতৃ-পদে প্রণাম করিলেন ও

তাঁহাদের কাছে নিবেদন করিলেন যে,—

জার লাগি মনস্তাপ পাঙ (পাওঁ) রাত্রি দিনে।
তান জ্যেষ্ঠ সহোদর আসিছে আপনে॥
তোহ্মা পুরী মধ্যে দেখহ যতন।
তান রূপে পুরী মোর হৈছে সুশোভন॥

বিধুপ্রভার পিতার নাম শাহাবাল ; তিনি গন্ধর্বদের রাজা ছিলেন। কন্যার অনুরোধে তিনি ইউসুফকে অভ্যর্থনা দান করিবার জন্য 'মধুপুরী' হইতে "পদরথি হাঁটিআ আইলা শীঘ্রগতি"। দেখা হইতেই, তিনি ইউসুফকে যোড়হস্তে প্রণাম করিয়া কি কারণে এই গন্ধর্বপুরে তাঁহার আগমন, তাহা জানিতে চাহিলেন। ইউসুফ মধুপুর-পতিকে সমস্ত কথা সুস্পষ্টভাবে জানাইলে, গন্ধর্ব-রাজ শাহাবাল সন্তুষ্ট চিত্তে বলিলেন,—

তোহ্মার অনুজ এবে আন শীঘ্র করি।
কুমারী বিবাহ সজ্জ এথা আহ্মি করি॥

গন্ধর্ব-রাজ-কুমারী বিধুপ্রভার এক শুক-পক্ষী ছিল। ইহার নাম "সুধীর ললিত"। এই পক্ষী "বহুল পড়িছে শাস্ত্র জানে তত্ত্ব সার"। পক্ষীটি আজিজের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। আজিজ-মিসর ইউসুফ পক্ষীকে বলিলেন যে, সৈন্য-সামন্তসহ 'সুবর্ণপুরীতে' তাঁহার ভ্রাতা বনী আমীন অবস্থান করিতেছেন, অথচ তিনি সে পুরীর পথের সন্ধান জানেন না। পক্ষীটি যেন 'সুবর্ণপুরীর' উদ্দেশ তাঁহাকে জানাইয়া দেয়। তখন 'সুবর্ণপুরী' হইতে বনী আমীনকে আনিবার জন্য, চন্দ্রপ্রভা তাঁহার শুক "ললিত সুধীরকে" পাঠাইয়া দিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে—

নৃপতি লেখিল পত্র ভাই সন্নিধানে।
পাত্রগণ প্রতি পত্র লেখে জনে জনে॥
এথা মধুপুরী আহ্মি আছি সাবধানে।
কোহ্ন চিন্তা তুহ্মি সব ন চিন্তঅ মনে॥

আম্মার কনিষ্ঠ ভাই ইবিন আমিন ॥
শুক সঙ্গে দি পাঠাঅ ন ভাবিঅ ভিন ॥
আম্মি এথা শাহাবাল নৃপতি সঙ্গতি।
কুটুম্বিতা তান মোর সম্বন্ধ পিরীতি ॥

পত্র লইয়া শুকপক্ষীকে 'সুবর্ণপুরীতে' পাঠানো হইল। পক্ষী যখন সুবর্ণপুরীতে পত্র লইয়া উপস্থিত হইল, তখন নিরুদ্দিষ্ট আজিজ-মিসরের খোঁজাখুঁজিতে তাঁহার পাত্র-মিত্র, সৈন্য-সেনা ও ভ্রাতা বনী আমীন ব্যস্ত-সমস্ত ছিলেন। পক্ষীর পত্র দেখিয়া খবরের প্রত্যাশায় সকলে বলিয়া উঠিল, "পত্র দেঅ পক্ষিরাজ এড়হ ভূমিত"। কিন্তু, কাহাকেও চঞ্চুস্থ পত্র না দিয়া—

পক্ষী বোলে ইবিন আমিন কার নাম।
সেহি আসি পত্র মোর লেহু এহি ঠাম ॥

পক্ষীর মুখে এই উক্তি শুনিয়া বনী আমীন তাহার মুখ হইতে পত্র লইয়া দেখিলেন যে, ইহা আজিজ-মিসর ইউসুফের পত্র। পত্র পাঠ করিয়া সকলে আশ্বস্ত হইলে, শুক পক্ষী বনী আমীনকে বলিল,—

শাহাবাল নামে রাজা গন্ধর্বের পতি।
তান কন্যা বিধুপ্রভা রূপেত পার্বতী ॥
স্বপনেত দেখিল সুরূপ মনোহর।
ইবিন আমিন মোর প্রাণের দোসর ॥

পক্ষীর মুখে এই কথা শুনিয়া এক বিস্মৃতপ্রায় অতীত স্বপ্নের স্মৃতি বনী আমীনের মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি এক গন্ধর্বসুতাকে বহুদিন পূর্বে স্বপ্নে দেখিয়া প্রাণেশ্বরী-রূপে বরণ করিয়াছিলেন। এখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই সেই গন্ধর্ব-নন্দিনী, যাঁহাকে তিনি স্বপ্নে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার হৃদয়ে সুষুপ্ত প্রেম বাত্যাবিক্ষুব্ধ বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ধৈর্যধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া শুকপক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—

সুধীর ললিত তোর পড়ঙ্ চরণে।
শীঘ্র করি কন্যা সন্ধে করাঅ মিলনে॥
পক্ষী বোলে শুন আএ নবীর সন্ততি।
এক মন্ত্র তোহ্মাক শিখাঙ ভাল অতি॥
সেহি মন্ত্র প্রভাবে হৈবা খগচর।
অবিলম্বে জাইবা তুহ্মি কুমারী গোচর॥

এই মন্ত্র 'গন্ধর্ব-মহামন্ত্র' নামে পরিচিত। ইহার কার্যকরী ক্ষমতা সম্বন্ধে অবগত হইয়া, খগচররূপে উড়িয়া তিনি 'সুবর্ণপুর' হইতে 'মধুপুর' যাইবেন কিনা, সে-বিষয়ে পাত্র-মিত্রদের সহিত পরামর্শ করিলেন। ঠিক হইল যে, এইভাবে বনী আমীনের মধুপুর যাওয়া চলে।

অতঃপর, শুক বনী আমীনের কানে 'গন্ধর্ব-মহামন্ত্র' কহিল। বনী আমীন পক্ষীর ন্যায় নভঃচারী হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই 'মধুপুর' চলিয়া গেলেন। তথায় ইউসুফের সহিত বনী আমীনের পুনর্মিলন ঘটিল। তখন ইউসুফ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। বনী আমীন এই কাহিনী শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনিও তাঁহার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট বিবৃত করিয়া কহিলেন,—

সেহি হোন্তে মোর মনে ন ভাবএ আন।
স্বপ্নে দেখা দিআ মোর হরিলেক প্রাণ॥

গন্ধর্ব-রাজ শাহাবাল মধুপুরে ইউসুফ ও বনী আমীনকে পরম যত্নে ও আদর-আপ্যায়নে সন্তুষ্ট রাখিয়া অতিথি-সৎকার করিতেছিলেন। ভৃত্যেরা তাঁহাদিগকে বাতাস করিতেছিলেন ও গন্ধর্ব-কন্যারা নাচিয়া-গাহিয়া আনন্দ করিতেছিলেন। এই সময়ে বিধুপুভা তাঁহার স্বয়ম্বরের আয়োজন করিবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিলেন।

॥ ১২ ॥

বিধুবতী-বিধুপ্রভার অনুরোধে মধুপুরে স্বয়ম্বর-সভার উদ্যোগ চলিল। চতুর্দিকে বিধুপ্রভার স্বয়ম্বরের আশু-সম্ভাবনার কথা প্রচার করিয়া দেওয়া হইল।

নানা দিগ্দেশ হইতে তরুণ রাজ-রাজড়ারা এ-স্থানে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনোরঞ্জনের জন্য—

বেয়াল্লিশ বাদ্যের ধ্বনি বাজে সুললিত।
মধুপুরী মধ্যে জেহ্ন অম্রুত পূরিত॥
জথ দেবগণ আছে আইল দেবপুরী।
ইন্দ্র বিদ্যাধরী নাছে হাথেত চামরী॥
পশু পক্ষী হরিষে করএ মৃদু ধ্বনি।
রভস বিলাসে নাচে গন্ধর্ব-রমণী॥

বিধুপ্রভাও স্বয়ম্বর সভায় গমন করিবার জন্য স্নানান্তে নানা বস্ত্র ও আভরণে সজ্জিতা হইতে লাগিলেন। তিনি অর্ধচন্দ্র আকৃতির কবরী বাঁধিলেন, বক্ষে অনুপম কাঁচুলি পরিধান করিলেন, বাহুতে তাড়, সু-অঙ্গুলে অঙ্গুরী, কটিদেশে কিঙ্কিণী, পদে মঞ্জীর পরিলেন। অধিকন্তু--

দেব আর গন্ধর্ব কুমারী জথ আছে।
সকল জোগান হৈল কন্যা চারিপাশে॥

এমন আড়ম্বরপূর্ণ স্বয়ম্বরের আয়োজন দেখিয়া ইউসুফের মনে কষ্ট হইল। কারণ, তখনও তাঁহার সৈন্যগণ সুবর্ণপুরীতে অবস্থিত বলিয়া এহেন নৃত্যগীত-সম্বলিত বিবাহের উপভোগ হইতে বঞ্চিত। তখন 'সুধীর-ললিত' নামক শুক পক্ষীটিকে ইউসুফ ও বিধুপ্রভা আদেশ দিলেন,—

অবিলম্বে চলি জাঅ সুবর্ণের পুরী।
সর্ব-সৈন্য আন গিআ কার্য-অনুসরি॥

শুক 'সুধীর-ললিত' পত্র লইয়া সুবর্ণপুরীতে চলিয়া গেল ও অল্পকাল মধ্যে ইউসুফের সৈন্যগণকে পত্র দিল। পত্র-পাঠান্তে সৈন্যগণ মধুপুরী অভিমুখে বিধুপ্রভার বিবাহে যোগ দিতে রওয়ানা হইল। যথাসময়ে তাহারা মধুপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফলে,—

দেব সৈন্য রাজ সৈন্য একত্র হইআ।
স্বয়ম্বর স্থানে বৈসে সমাজ করিআ॥
দুই রাজ্য বাদ্য বাজে জয় শঙ্খ ধ্বনি।
বিবাহ মঙ্গলা গাহে দেবের রমণী॥

তখনও বিধুপ্রভা স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করেন নাই। তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় সমবেত পাণিপ্রার্থিগণ অধীর। দর্শকগণের অবস্থাও প্রকৃতপক্ষে তথৈবচ। অত্যল্পকাল মধ্যে সখী ও সহচরী সংবেষ্টিতা হইয়া, বিধুপ্রভা কুঞ্জর-গমনে স্বয়ম্বর-সভায় প্রবেশ করিলেন। অমনি—

উৎকণ্ঠ নৃপ সভ নয়ান চঞ্চল।
দেখিআ কন্যার রূপ হইলা বিকল॥
কার আড়ে কেহো চাহে অলক্ষিত হৈআ।
কুমারী আসিছে সভে আছিল হেরিয়া॥
... ...
পশু পক্ষী হরিষে অস্তুত করে ধ্বনি।
স্বর্গেত হরিষে নাচে অমর রমণী॥

বিধুপ্রভার হাতে পুষ্পমালা ছিল। এই বরমাল্য তিনি কাহার গলায় পরাইবেন, তখনও তাহা কাহারও জানা ছিল না। মালা হাতে বিধুপ্রভা সভায় প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে হাঁটিয়া চলিলেন। তাঁহার পাণিপ্রার্থীদের মধ্য হইতে তিনি যাঁহাকে পাছে ফেলিয়া আগাইয়া চলিলেন, তাঁহার মানসিক দুর্দশার অন্ত রহিল না। চলিতে চলিতে বনি আমীনের সমীপবর্তিনী হইয়া তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিতেই—

জয় জয় শব্দ হৈল স্বয়ম্বর পুর।
দোহানে দোহান দেখি আনন্দ মন ভোর॥
... ...
মুখরোল কৈল জথ গন্ধর্বের নারী।
দুহু জন বসাইল নিআ অন্তঃপুরী॥

নানা হাসি-ঠাট্টা ও আমোদ-প্রমোদে স্বয়ম্বর-দিবস অতিবাহিত হইল। নিশাভাগে বিধুপ্রভা ও বনী আমীন বাসর যাপন করিলেন। প্রভাতে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া বিধুপ্রভা বনী আমীনকে বলিলেন,—

আউল হইল কেশ মুকল কুন্তল।
কানড়ী কবরী বান্ধি দেঅ পুষ্পদল॥

এইরূপ ভোগ-উপভোগে সাত রাত্রি সাত দিন কাটিয়া গেল। গন্ধর্ব-রাজ শাহাবাল সভা করিয়া বসিলেন। আজিজ-মিসির ইউসুফ এবং তৎভ্রাতা বনী আমীনও সেই সভায় যোগ দিলেন। গন্ধর্ব ও মানব একত্র বসিয়া নানাবিধ চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্রব্যাদি আহার করিল। আহারান্তে শাহাবাল বলিলেন—

পুত্র নাহি মোর ঘরে দিতে রাজ্য ভার।
জামাতাক রাজ্য দিমু দেব অধিকার॥

আজিজ-মিসর এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বনী আমীনকে শুভক্ষণে রাজ্য দানের জন্য আয়োজন করিতে বলিলেন। অতএব, নরপতি শাহাবাল অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া জামাতাকে রাজ্যভার অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। অভিষেকের আয়োজন চলিল—

নানান তীর্থের জল আনে ঘট ভরি।
সুরভি দুগধ আনি অভিষেক করি॥
পাত্র সভে বসাইল রাজ সিংহাসনে।
চামর দোলাএ আসি জথ দেবগণে॥
বিধুপ্রভা ইবিন আমিন সঙ্গে করি।
তান ঠাঁই সমর্পিল রাজ্য অধিকারী॥

মধুপুরীতে বনী আমীনের রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া, ইউসুফ মিসর দেশে ফিরিয়া গেলেন। মিসর যাত্রাকালে তিনি বনী আমীনকে বলিলেন যে,—

তুহ্মি রহি থাক এথা রাজ্য অধিকার।
পশ্চাতে জাইবা তুমি বাপ দেখিবার॥

ইউসুফ মিসরে পৌঁছিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বৃদ্ধ নবীকে বলিলেন। নবী এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সুখী হইলেন। অতঃপর, ইউসুফ এমন সুখ্যাতি সহকারে রাজ্য পালন করিলেন যে,—

রামেহো নারিল হেন রাজ্য পালিবার।
বলি কর্ণ দানে সম ন হৈল তাহার॥

এদিকে মধুপুরীতে বনী আমীন বেশ কিছুদিন বাপ ভাই-এর বিচ্ছেদে কাটাইয়া দিয়া অস্বস্তিবোধ করিতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে প্রায়ই শোকাকুল দেখাইত। এমন কি, তাঁহাকে কখনও কখনও রোরুদ্যমান অবস্থায়ও দেখা যাইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন বিধুপ্রভা তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া কি কারণে তিনি এহেন বিষাদিত মনে কালাতিপাত করিতেছেন, তাহা জানিতে চাহিলে—

কুমারে বোলন্ত শুন রাজক নন্দিনী।
বাপ ভাই বিনে নিত্য জলএ আগুনি॥
বাপ ভাই পদ প্রণামিআ এক মতি।
আজ্ঞা দেঅ জাইআ আসিমু শীঘ্রগতি॥
কুমারী বোলএ আহ্মি জাই তোমা সঙ্গে।
বৃদ্ধ নবী চরণ বন্দিমু গিআ রঙ্গে॥
এথ শুনি কুমার সন্তোষ হৈল মন।
কুমারী চলিলা সঙ্গে লৈআ পরীগণ॥

যথা সময়ে বনী আমীন ও বিধুপ্রভা মিসরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যে ভ্রাতা ও পিতার সহিত মিলিত হইবার জন্য দেশে আগমন করিতেছেন, এই সংবাদ দেখিতে দেখিতে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। আজিজ-মিসর ইউসুফ তাঁহাদিগকে সাদরে ও সানন্দে অভ্যর্থনা দান করিলেন।

তাঁহারা নবীর পদধূলি লইলেন। নবী তাঁহাদের মস্তকে চুমা দিয়া তাঁহাদিগকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন। অতঃপর বধূ-বরণ প্রভৃতি স্ত্রী-আচার শুরু হইল। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া—

মঙ্গলা করিআ তবে জলিখা সুন্দরী।
অন্তঃপুর মধ্যে কন্যা নিলা হাথে ধরি॥
অন্যে অন্যে দুই দেবী সম্ভাষা আছিল।
বিধুপ্রভা জলিখাক চরণ বন্দিল॥
প্রেমভাবে আলিঙ্গিআ কোলে বসাইলা।
সন্তোষে জলিখা বিবি আশীর্বাদ কৈলা॥
... ..
কন্যা সঙ্গে ইবিন আমিন মুখ দেখি।
আজিজ জলিখা মন হৈল বহু সুখী॥
... ...
ইছুফ জলিখা বন্ধু বান্ধব সংহতি।
সুখে নিবাসএ হৈআ রাজ্য অধিপতি॥
মধুপুরী ইবিন আমিন অধিকার।
পরিচর্যা গন্ধর্বে করন্তি অনিবার॥

এইভাবে ইউসুফ আজিজ-মিসর বা মিসরের রাজারূপে সপরিবারে মিসরেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার পিতা এয়াকুব নবী ও ভ্রাতৃবর্গও ছিলেন। কিন্তু, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বনী আমীন বিধুপ্রভাকে লইয়া মধুপুরীতেই চলিয়া যান এবং তথায় গন্ধর্ব-রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

এইখানেই "ইউসুফ জলিখা" কাব্য শেষ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)